২৬ জুন ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

খেলাধুলো

"দিদা, দিদা, বাবা আজকে এতো দুষ্টুমি করছে কেন?"

"কেন রে ছোটন কি করেছে?"

"দেখ না! লক্ষী ছেলের মত খাচ্ছে না।"

"পেট খারাপ হয়েছে যে। পেট খারাপ হলে হজম হয় না, তাই কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।"

"কিন্তু না খেলে যে গায়ে জোর পাবে না—আর কালকে বেরোবে কি করে?"

"তুমি কিছু ভেবো না। আমি এমন জিনিস্ দেবো যা চট করে হজম হয়ে যাবে। জান সেটা কি? ওই যে তুমি রোজ যেটা খাও!"

"জানি! রবিনসন্স্ বার্লি।"

"ঠিক বলেছ। এই বার্লি খুব হাল্কা খাবার বলে চট করে হজম হয়। তাছাড়া খাঁটি বার্লির সব গুণই রবিনসন্স্ বার্লিতে আছে। তাই পেট খারাপ হলে ডাক্তারবাবুরাও রবিনসন্স্ বার্লি খেতে বলেন।"

"আচ্ছা দিদা..."

"আর কথা নয়। নাও এই এক গেলাস বার্লি বাবাকে দিয়ে এস দেখি?"

"বাবা, বাবা, এই নাও তোমার রবিনসন্স্ বার্লি।"

রবিনসন্স্ বার্লি

হালকা আহার আর সহজ হজমের পথ্য

LINTAS(C)/ROB/4/2416 BG

আনন্দমেলা

১১ আষাঢ় ১৩৯২ : ২৬ জুন ১৯৮৫ : ১১ বর্ষ ৬ সংখ্যা

গল্প

পিলকিন'স ইলেভেন। বিমল কর ৯

রাত যখন বারোটা। সুব্রত নিয়োগী ২৪

ভাঙা দেউলের প্রহরী। সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ৪৪

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

জুবিলি সার্কাসের আজব খেলা। অজেয় রায় ৩৫

ধারাবাহিক উপন্যাস

শয়তানের চোখ। সমরেশ মজুমদার ১৫

গোলমাল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৯

বিশেষ রচনা

ভারত চেনার উৎসবে। চঞ্চল পাল ৩১

দাদুর একুশবারের জন্মদিনে। বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫

বিদ্যালয়-পরিচিতি

বড়িশা হাইস্কুল। শ্যামলকান্তি দাশ ৫৩

শার্লক হোমসের গল্প

বুটিদার ফেট্টি। সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১

বিজ্ঞান বিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫

জেনে নাও। অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫

লেখাপড়া

কুড়িয়ে পাওয়া(সহজে ইংরেজি)। প্রসাদ ৭

ডামাডোল (অর্থ জানো)। দেব-সেনাপতি ৭

ছড়া ও কবিতা

বুলটি। গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩

ফ্রি গিফ্‌ট। রূপক চট্টরাজ ৪৩

সার্জারি। অশোককুমার মিত্র ৪৩

খেলাধুলো

সাতাশির স্বপ্ন। অশোক রায় ৬৩

ব্যাট হাতেও মার্শাল মারাত্মক। সম্রাট রায় ৬৪

ব্যাট দিয়ে যায় চেনা। রাজা গুপ্ত ৬৫

সোনালি বিকেল, হারানো অতীত। নৃপতি চৌধুরী ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩৪

সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬২

অন্যান্য আকর্ষণ

তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮

মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সব শিশুরই
এক সুর
গেঞ্জি পরুন
কোহিনুর

কোহিনুর নিটিং মিলস্
গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে এসেছেন যার — সেই, জনসন্স বেবী পাউডার — কোমল যেন মমতার পরশ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বরষিত হয় আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

LINTAS J&J 23 2619 BG

বিবর্তনের জাদুঘর

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আচ্ছা, তুমি কান নাড়াতে পারো ? না, না, আমি তোমাকে অন্য কিছু ভেবে বলিনি। আসলে আমার এক বন্ধু ছিল। সে কান নাড়াতে পারত। কান নাড়াতে পারলে খরগোশ কিংবা জেব্রার মতন আমরাও কান উঁচিয়ে বিপদ আঁচ করতে পারতাম। মানুষের পূর্বপুরুষেরাও পারত এমনিভাবে কান নাড়াতে। কান নাড়াবার কতকগুলো মাংসপেশি আজও আমাদের শরীরে আছে। আমরা আজ আর সেগুলোকে কাজে লাগাই না এই যা।

আমাদের শরীরে এই রকমের কিছু কিছু জিনিস রয়ে গেছে। এক সময়ে মানুষের পূর্বপুরুষেরা সে সব কাজে লাগাত। আমাদের আর তার দরকার হয় না। এগুলোর ইংরিজি নাম 'ভেস্টিজিয়াল স্ট্রাকচার্স'—বাংলায় বলা যায় অভিজ্ঞান-অঙ্গ। অভিজ্ঞান হল সেই জিনিস, যা দেখে পুরনো কথা মনে পড়ে। মানুষের দেহে এই রকমের কম করে ১৮০টি অভিজ্ঞান-অঙ্গ আছে। তাই ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জুলিয়াস হাক্সলি মনুষ্যদেহের নাম দিয়েছিলেন 'ক্রমবিবর্তনের জাদুঘর'।

কাপড় পরতে শেখার ঢের আগে বনমানুষের মতন মানুষেরও গা-ভর্তি লোম ছিল। মানুষের গায়ে আজ লোম নেই বটে, কিন্তু লোম নাড়াবার মাংসপেশিগুলো রয়ে গেছে। বেড়ালকে কখনও শীতকালে আগুন পোয়াতে দেখেছ ? তখন তার লোমগুলো গায়ের সঙ্গে সাঁটা থাকে। যেই ঠাণ্ডায় যায়, অমনি লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। তাতে হাওয়া আটকে গিয়ে শরীর গরম থাকে। আমাদের গায়ের লোম হাজার পাতলা হলেও এখনও গরমে গায়ে লেপ্‌টে থাকে আর ঠাণ্ডায় গায়ে কাঁটা দিয়ে সেগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

আমাদের চোখের ভেতর এককোণে আছে লালচে রঙের একটা পাতলা পর্দা। ব্যাং বা ব্যাং জাতীয় প্রাণীদের চোখে এখনও পুরোদস্তুর রয়েছে এই পর্দা। জলে সাঁতার কাটার সময় এই স্বচ্ছ পর্দাটা তারা চোখের ওপর টেনে দেয়। কাজে লাগে না বলে আজ আমাদের চোখে এই পর্দা থেকেও নেই।

দেখা গেছে, সদ্যোজাত মানবশিশু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে মিনিট কয়েক ঝুলে থাকতে পারে। বাঁদরের বাচ্চা যেমন মা'-র গায়ের লোম আঁকড়ে ধরে থাকে। এও হচ্ছে দূর অতীতে পূর্ব পুরুষদের গাছের ডাল ধরে বেড়ানোর সেই অভ্যেস —আজও যা মানুষের মধ্যে টিকে থেকে পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

তা হলে ? এদের পূর্বপুরুষ নিশ্চয় এক। (ক্রমশ)

জেনে নাও

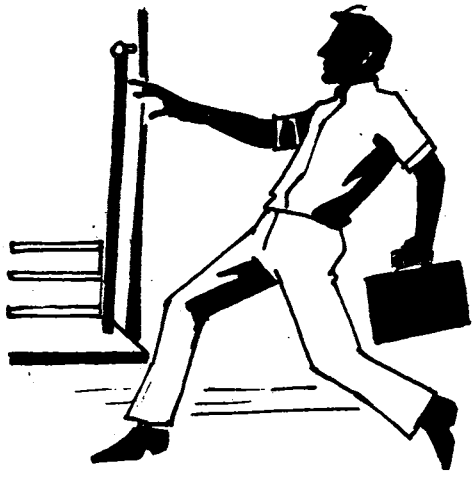

চলন্ত বাস থেকে নামার সময়

চলন্ত বাস থামল। ঠিক জায়গা এসে গেছে। যে-কোনোভাবে নামলেই তো হয়—কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে শরীর ঈষৎ পেছন দিকে ঝুলিয়ে নামতে হয় কেন ?

আগে একটা বইয়ের কথা ধরা যাক। বইটা স্থির, আছে টেবিলের ওপরে। কেউ না সরালে সেটা টেবিলের ওপরেই থাকবে, যেমন আছে। স্থির বস্তুর ধর্মই তাই। সে চিরকাল স্থির থাকবে। সেই রকম যে বস্তু সচল তার সচল থাকার কথা বরাবর। কিন্তু তার চারপাশে অনেক বাধা। যদি কোনো বাধা না থাকত, তাহলে যে গতিতে তার চলা শুরু, সেই গতিতেই সে চলত।

চলন্ত বাসের বেলায় কী হয় ?

সে বাস সামনে এগোচ্ছে। তার ভেতরে আমি বা তুমি। বাসের গতি আমাদের গতি। ফলে বাস থামলেও শরীর থামতে চায় না। সামনে এগোনোর ঝোঁকে সে এগিয়ে যেতে চায় সামনে। এটাই তখন বিজ্ঞানের চাহিদা। সেই জন্যে শরীর ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে।

অবস্থাটাকে সামাল দিতে বাস থেকে নামবার সময়ে সামনের দিকে তাকিয়ে একটু পিছনে হেলে নামলে উলটে পড়ার ভয় থাকে না।

কিন্তু পেছন দিকে মুখ করে নামলে কী হবে ? তখন সামনের দিকে ঝোঁকের জন্যে উল্টে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

গ্রীষ্মের দিনগুলিতে ...
আপনাকে রক্ষা করবে
ঘামাচি থেকে
সারাদিন রাখবে
তাজা ঝর-ঝরে...
Borocalendula
PRICKLY HEAT POWDER
বোরো ক্যালেনডুলা*
প্রিক্‌লিহিট পাউডার
স্নানের পর সারাগায়ে ছড়িয়ে দিন
বোরো ক্যালেনডুলার সুগন্ধিত পরশ...
HL
এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন
* A PATENT AND PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12.
anjan chakraborty, Cal-74

সহজে ইংরেজি

কুড়িয়ে পাওয়া

One day Chameli came back excited from school. "Can you guess what happened to Sujata today, Mummy?" she cried. "I'm sure you can't."

মা জানেন, এখন মিলিকে হাতমুখ ধুতে কিংবা কিছু খেতে বলা বৃথা।

"Sujata?" she asked. "A friend of yours?"
Milly said Sujata was her best friend.
"But only the other day you said your best friend was Sangeeta," Mrs. Roy said, surprised.
Milly said, "Not any more. Now listen to what happened today. After school Sujata said, 'Let's go to the bookstore for a minute.' There's that bookstore across the street from our school, you know. Just as we were coming out of the shop Sujata stooped down and picked up something from the pavement. Then she showed it to me. It was a wallet."
Mrs. Roy said, "Really? Was there a lot of money in it?"
"Quite a lot, Mummy. Sujata and I counted. Three hundred and seventy rupees. All the girls said Sujata was very lucky."
Mrs. Roy said, "But the money still doesn't belong to her, you know. She'll have to try to return it to its owner."
"Oh, no, Mummy!" Milly cried. "Why can't poor Sujata keep it? She said she was going to give us a party with the money."
Mrs. Roy said, "She can't keep what doesn't belong to her. I'm sure her parents will make her see that."

তার দু'দিন পরেই সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মা বললেন :

"Milly, what did you say your friend's name was? Is it Sujata? Look, she has put in a notice in the newspaper about that wallet. Now its owner can get it back."

তোমাদের আগেই বলেছি, ইংরেজিতে এইভাবে লিখতে হয় ;

He said he was my neighbour.

যদিও যে বলছে, সে এখনও আমার প্রতিবেশী।
তার মানে, "বলছিল", এই ক্রিয়াপদটা তো অতীতকালের, তাই সে যা বলছিল, তার ক্রিয়াপদটাও অতীতকালের হবে। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি রীতির এই তফাতটা যাতে তোমরা কখনও ভুলে না যাও, তাই এবারেও এই ধরনের কতকগুলো বাক্য তোমাদের লক্ষ করতে বলছি।

Only the other day you said your best friend was Sangeeta.
She said, she was going to give us a party.
What did you say her name was?

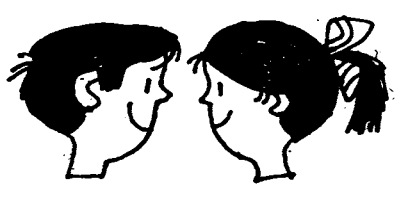

প্রসাদ

অর্থ জানো

ডামাডোল ... গুলবাগ

শব্দকে ভালবাসতে শেখো। তবেই তো ভাষাকে ভালবাসতে শিখবে। কিন্তু শব্দকে ভালবাসতে হলে তার সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। সেই অন্তরঙ্গতা আসে অর্থ জানার মধ্য দিয়ে। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **ওয়াকিফহাল**— (ক) পারদর্শী, (খ) যে অবস্থা জানে, (গ) সর্বজ্ঞ, (ঘ) জ্ঞানী।

২। **মহাফেজখানা**— (ক) নবাবি আমলের বৃহৎ কক্ষ, (খ) নবাবদের বড় খাবার-ঘর, (গ) জাদুঘর, (ঘ) যেখানে সরকারি কাগজপত্র রক্ষিত হয়।

৩। **ডামাডোল**— (ক) মারামারি, (খ) অভাব অনটন, (গ) কোলাহল, (ঘ) দৌড়-ঝাঁপ।

৪। **গুলবাগ**— (ক) গোলাপফুল, (খ) হিংস্র চিতা, (গ) গোলাপবাগান, (ঘ) বৃত্তাকার বাগান।

৫। **হিস্যা**— (ক) উত্তরাধিকার, (খ) ভাগ, (গ) দখল, (ঘ) হিসাব।

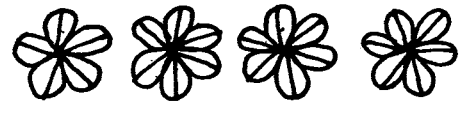

উত্তর : ১। **ওয়াকিফহাল**— (খ) যে অবস্থা জানে। ওয়াকিফ আরবি শব্দ, যার অর্থ : যে জানে। হাল ফারসি শব্দ, যার অর্থ : অবস্থা। বাংলায় ওয়াকিবহাল বা ওকিবহাল রূপেও এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, 'পরে ওকিবহাল হয়ে জানলুম, বন্ধুদর্শনে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই' (মুজতবা আলী)।

২। **মহাফেজখানা**— (ঘ) যেখানে সরকারি কাগজপত্র রক্ষিত হয়। মূলে আরবি শব্দ মহাফিজ, যার অর্থ : যে রক্ষা করে। খানা শব্দের অর্থ : ঘর বা বাড়ি। ইংরেজিতে বলা চলে Record Room। যেমন, দিল্লির মহাফেজখানায় ওই ঐতিহাসিক দলিল রাখা আছে।

৩। **ডামাডোল**— (গ) কোলাহল। এটি দেশী শব্দ। কখনও বা বিশৃঙ্খল অর্থেও প্রয়োগ হয়। নির্বাচনের ডামাডোল অর্থ নির্বাচনের হট্টগোল।

৪। **গুলবাগ**— (গ) গোলাপবাগান। ফার্সি বাগ শব্দের অর্থ : বাগান। এবং গুল শব্দের অর্থ : গোলাপ। যেমন, 'আনো আতরদানি গুলবাগে' (কবি নজরুল)। গুল কখনও কখনও সাধারণ ফুল অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৫। **হিস্যা**— (খ) ভাগ বা অংশ। মূল শব্দ আরবি হিস্যা, যার অর্থ : ভাগ। যেমন, 'আমি দু একবার আমার হিস্যা দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম' (মুজতবা আলী)।

দেব-সেনাপতি

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিনথ – যা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2418 BG

এটা কি ফুটবল-খেলা, না সার্কাস ?

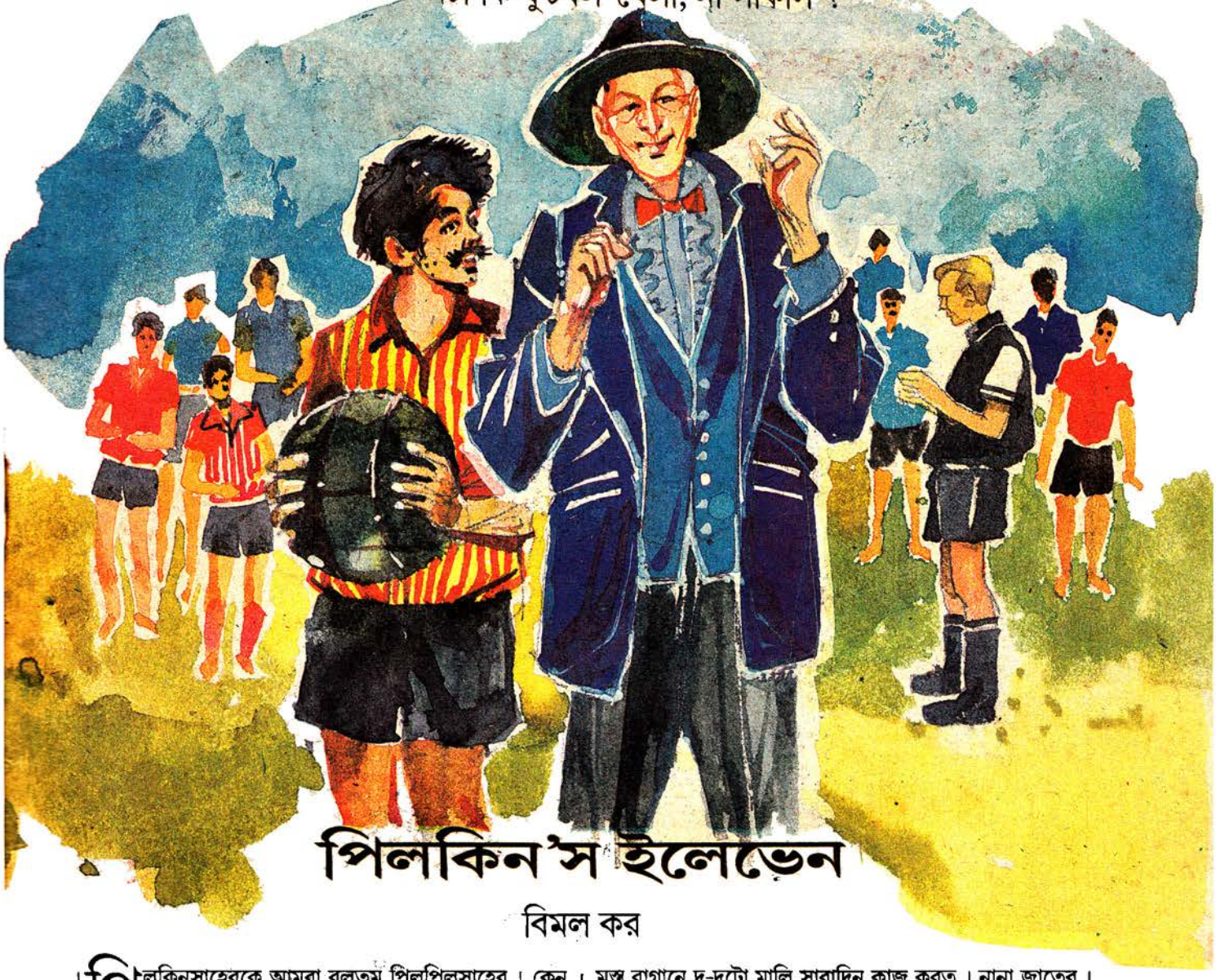

পিলকিন'স ইলেভেন

বিমল কর

পিলকিনসাহেবকে আমরা বলতুম পিলপিলসাহেব। কেন বলতুম জানি না। বোধহয় সাহেবের চেহারার জন্যে। মাথায় বেশ লম্বা, চেহারায় রোগা। ঢ্যাঙা চেহারার মানুষকে এমনিতেই দেখতে রোগা-রোগা লাগে ; তার ওপর যদি সে সত্যিই রোগাটে হয়—তাকে কেমন লাগবে দেখতে ? তালগাছ, না, সুপুরিগাছ ? তা যেমনই লাগুক পিলকিনসাহেবের পিলপিল নামটাই চালু হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের কোলিয়ারিটা ছিল বড়। সাহেব কম্পানির কোলিয়ারি। সাহেবসুবোদের ম্যানেজার করে পাঠানোই রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল মালিকদের। পিলকিনসাহেব যখন এলেন তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ হয়ে গিয়েছে। মানুষটি কাজের ছিলেন, ভাল ছিলেন। মজার ছিলেন। তাঁর যথেষ্ট নামডাক হয়েছিল কোলিয়ারি মহলে।

পিলপিলসাহেবের শখ বলতে ছিল তিনটে জিনিস। গাড়ি, বাগান আর ফুটবল। সাহেবের একটা টু-সিটার হিলম্যান গাড়ি ছিল। রঙ ছিল টকটকে লাল। সেই গাড়িতে একটা আঁচড় পড়লে সাহেবের সর্দি ধরে যেত মনের দুঃখে। আর ম্যানেজার পিলকিনের বিশাল বাংলো বাড়িতে গাছের অভাব ছিল না। মস্ত বাগানে দু-দুটো মালি সারাদিন কাজ করত। নানা জাতের নানা বাহারের ফুল ফুটত বাগানে। বাঙালিবাবুরা বলতেন, পিলপিলের নন্দনকানন।

গাড়ি আর বাগান নিয়ে পিলপিলসাহেবের যতই মায়া-মমতা থাক—তাঁর প্রাণ বলতে ছিল 'পিলকিন'স ইলেভেন'। পিলকিন'স ইলেভেন মানে সাহেবের কোলিয়ারির ফুটবল টিম।

ছোট সাহেবদের মধ্যে পিলকিন'স ইলেভেন নিয়ে হাসিঠাট্টা হত। কেউ বলতেন, পিলকিনের এগারোটি বাঁদর ; কেউ বলতেন, এগারোটা ধেড়ে বজ্জাত ; কেউ বা বলতেন, সাহেবের পোষ্যপুত্র সব।

এঞ্জিনিয়ার সেনগুপ্তকাকা বলতেন, "মেমসাহেব মারা গি য়েছেন, মেয়ে দেরাদুনে থেকে পড়াশোনা করে, সাহেব কী নিয়ে আর থাকবেন ! তাই ওই পিলকিন'স ইলেভেন। খ্যাপা মানুষ। তা ছাড়া পিলকিন নিজে একসময় খেলাধুলো করতেন তো ! তাই এত সব।

আমাদের কোলিয়ারিতে ফুটবল খেলার রেওয়াজ তেমন ছিল না। বাচ্চাকাচ্চারা খেলতুম। বড়রা আর খেলবে কখন ? সারাদিন কোলিয়ারির কাজকর্ম সেরে সময় কোথায় খেলার !

তবু গরমে আর বর্ষায় হাটের পাশে ন্যাড়া মাঠে গদাইদা, রাখহরিদা, রামভরত, সাহানাবাবু —মাঝে-মাঝে ফুটবল নিয়ে নেমে পড়ত। সে ছিল মজার খেলা। হাট-বাজার করতে এসে খানিকটা বল পেটাপেটি।

পিলকিনসাহেব কোলিয়ারিতে আসার পর নিজে উদ্যোগী হয়ে একটা দল করলেন। হাটের মাঠে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করালেন জনা-বিশেক জোয়ান ছেলেকে—তার মধ্যে গদাইদারা থাকল। শেষমেষ আনাড়িদের বাদ দিয়ে সাহেবের দল গড়া হল। নাম হল, পিলকিন'স ইলেভেন।

পিলকিন'স ইলেভেনের সবাই কোলিয়ারিতে কাজ করত। কেউ ইলেক্‌ট্রিশিয়ান, কেউ ফিটার, কেউ ওয়ার্কশপের মিস্ত্রি, কেউ অফিসের কেরানি, কেউ বা হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। দত্তসাহেব বলতেন, 'দামড়া ইলেভেন।'

পিলকিন'স ইলেভেন প্রথম খেলা খেলতে গেল বার্নপুরের মাঠে। ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ, সাত গোল খেয়ে ফিরে এল। সে-খেলা আমরা দেখিনি, শুনেছি বার্নপুর কারখানার দল শুয়ে বসে হেসে হেসে খেলে মাত্র সাত গোল দিয়ে ভদ্রতা করে ছেড়ে দিয়েছিল পিলকিন'স ইলেভেনকে।

পিলপিলসাহেব বড়ই দুঃখ পেয়েছিলেন সেদিন। সাত দিন আর জলস্পর্শ করেননি। তবে দমে যাননি মোটেই, টিমের ছেলেদের বলেছেন, "নেভার মাইণ্ড, আচ্ছাসে খেলো।"

সেবারের মরসুমে পিলকি'নস ইলেভেন্ যাদের সঙ্গেই খেলেছে, সে যেমন খেলাই হোক পাঁচ সাত দশ গোলে হেরেছে।

পরের বছর পিলকিন'স সাহেব নিজের কোলিয়ারিতে চাকরি দিয়ে দু একজন নতুন খেলোয়াড় আনালেন। তার মধ্যে ফণিদা আর গণপতি ভাল খেলোয়াড়। দেখা গেল, উন্নতি হয়েছে। ধানবাদের রেল-মাঠে ভাওড়া কোলিয়ারির সঙ্গে খেলায় পিলকিন'স ইলেভেন পাঁচ গোলে হারল। তা খারাপ কী? ভাওড়া কোলিয়ারি নামকরা দল। শিল্ড চ্যাম্পিয়ন।

তার পরের বছর পিলপিলসাহেব নিজের কোলিয়ারিতেই এক টুর্নামেন্ট লাগিয়ে দিলেন। কোলিয়ারির সেটা পঁচিশ বছর। সিলভার জুবিলি। টুর্নামেন্টের নাম দেওয়া হল, জুবিলি কাপ। শুধু কোলিয়ারি দলরাই সেই টুর্নামেণ্টে খেলতে পারবে।

সাহেবের প্রতিপত্তি কম ছিল না। নিজেই এখানে-ওখানে চিঠি লিখলেন, গাড়ি হাঁকিয়ে দেখা করতে গেলেন, অন্য কোলিয়ারির ম্যানেজারদের সঙ্গে। বারো চোদ্দটা দল রাজি হয়ে গেল খেলতে।

এরপর হই-হই করে মাঠ পরিষ্কারের কাজ হতে লাগল। পিলপিলসাহেব নিজে তদারক করতে লাগলেন। মাঠ পরিষ্কার হল, গোলপোস্ট পোঁতা হল, মাঠের পাশে একধারে টিনের শেড তৈরি হল ছোট করে, গণ্যমান্যরা বসবেন। খেলোয়াড়দের প্যাণ্টজামা বদলাবার জন্যে তাঁবু বসানো হল।

আমাদের কোলিয়ারিতে হৈ-চৈ করার মতন কাণ্ড-কারখানা দু-চারটে হত। কালীপুজো, যাত্রা, বেবি শো—এই সব আর কি! কিন্তু ফুটবল খেলার হৈ-চৈ ছিল না। আমরা, বাচ্চাকাচ্চার দল তো মহা খুশি। রোজ বিকেল বেলায় দল বেঁধে গিয়ে মাঠ পরিষ্কার, তাঁবু খাটানো দেখতাম।

শেষ পর্যন্ত একদিন ধুমধাম করে জুবিলি কাপের খেলা শুরু হল। আসানসোল থেকে ইব্রাহিমের ব্যাণ্ড-পার্টি এল বাজনা বাজাতে, কলকাতা থেকে বাজি এল দু-চার ঝুড়ি, দমাদ্দম বাজি ফাটল, তুবড়ি পুড়ল, হাওয়াই ছুটল।

আমাদেরই হল মজা। জুবিলি কাপের খেলা থাকত রোজই প্রায়। আমরাও বিকেল হল কি, মাঠের দিকে ছুটতাম। রোজই ভিড় হত মাঠে।

পিলকিন'স ইলেভেনকে সাহেব ততদিনে পাকা করে ফেলেছেন। টপাটপ বেড়া ডিঙিয়ে সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত চলে গেল তাঁর দল। লোদনা কোলিয়ারি, শ্রীপুর, ভিক্টোরিয়া—তিন তিনটে কোলিয়ারিকে হারিয়ে একেবারে সেমি-ফাইনাল। আমরা বগল বাজাতে লাগলাম। মন্দ লোকে অবশ্য বলত, রেফারিগুলো চোট্টামি করছে। সে-কথায় কে কান দেয়। আমরাও দিতাম না।

সেমি-ফাইনালে খেলা পড়ল সেই ভাওড়া কোলিয়ারির সঙ্গে। বড় শক্ত টিম। পাকা টিম। তা ছাড়া ওদের দলে জন বলে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্লেয়ার আছে। বুট পরে খেলে। জবরদস্ত খেলোয়াড়। তার সঙ্গে আছে বানোয়ারিলাল, সে একেবারে পেছল শোলমাছ, সুড়ুত্ করে পিছলে একেবারে গোলের কাছে চলে যায় একটু ফাঁক-ফোকর পেলেই। তার সবই ভাল, শুধু একটা দোষ আছে। কোনও প্লেয়ার যদি তার গায়ে গায়ে এসে পড়ে ব্যস্ হয়ে গেল। বানোয়ারির কাতুকুতু লেগে যায়। বল ছেড়ে দিয়ে সে হাসতে শুরু করে।

খেলার দিন, সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল। ভাদ্র মাস। ঘণ্টা-দুয়েক জোর বৃষ্টির পর মেঘ কাটল। আমাদের মনের মেঘ কিন্তু কাটল না। আজ পিলকিন'স ইলেভেনের হয়ে গেল। অবধারিত হার। কমপক্ষে তিনটে গোল হজম করতে হবে। কোলিয়ারিতে একটাও জাগ্রত ঠাকুর-দেবতা নেই যে আমরা মানত করে আসব। সম্ভু দামড়া গাঁয়ের ধর্মরাজ ঠাকুরকেই মানত করে এল।

বিকেলে মাঠে গিয়ে দেখি পিলপিলসাহেব তখনও তাঁর দলবল নিয়ে আসেননি। কোলিয়ারির অর্ধেক লোক এসে মাঠের তিন পাশ দখল করে বসে পড়েছে। আমরা তাঁবুর দিকটায় জায়গা করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেশ একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব লাগছিল।

মাঠের অবস্থা মন্দ নয়। জলে কাদায় ভর্তি হয়নি মাঠ; তবে জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে, কোথাও-কোথাও সামান্য কাদা।

খেলা শুরুর খানিকটা আগে পিলপিলসাহেব তাঁর দল নিয়ে মাঠে এলেন। কোলিয়ারির ট্রাকে করে এসেছেন। প্লেয়াররা একেবারে তৈরি। আমরা হই-হই করে উঠলাম।

ভাওড়া কোলিয়ারি দল আগেই মাঠে নামল। হলুদ রঙের গেঞ্জি তাদের জার্সি। আমাদের হল নীল শার্ট।

ভাওড়ার দল মাঠে নামতেই আমাদের কোলিয়ারির লোকরা নানানরকম শব্দ করতে লাগল মুখে। কেউ কুকুর ডাক ডাকল, কেউ ছাগল-ডাক ডাকল। শেয়ালের ডাকও ডাকতে লাগল। ভাওড়ার দল গ্রাহ্য করল না। তারা এমন ভাব করতে লাগল যেন ওরা সব হুলো বেড়াল; এগারোটা নেংটি ইঁদুর তাদের কাছে কিছুই নয়।

পিল্‌কিন'স ইলেভেন মাঠে নামার আগে পিলপিলসাহেব তাঁর দলকে কী যেন মন্তর দিয়ে দিলেন কানে কানে। আমরা দেখলুম সাহেব আমাদের হাফ্‌ ব্যাক বদুদাকে আলাদাভাবে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছু বলছেন।

বদুদা— মানে বদ্যিনাথ চট্টরাজকে লোকে জ্যান্ত মহিষাসুর বলত। বিশাল চেহারা, কুচকুচ করছে গায়ের রঙ, মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া। বদুদা নাকি একটা পুরো খাসির মাংস সাবাড় করতে পারে। কোলিয়ারির যাত্রা-পার্টিতে বদুদাকে কখনও যমরাজ, কখনও কুম্ভকর্ণ, কখনও অসুর জলন্ধরের সেনাপতির পার্ট দেওয়া হয়। কথাবার্তায় পুরো মানভূমি টান। সেই টানেই পার্ট বলে যায়।

যাই হোক, খেলা শুরু হল। শুরুতেই সেই বানোয়ারিলাল আমাদের চমকে দিয়েছিল। একটা গোল হতে হতে হল না। কেমনভাবে যেন বলটা বাইরে বেরিয়ে গেল। নয়তো হয়ে যেত।

প্রথমটায় আমাদের পিলকিন'স ইলেভেন শুধুই নাচতে লাগল। আমাদের তখন বুক ধসে যাচ্ছে! তবু সারা মাঠ চেঁচাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। ধরে ফেল, মেরে দে, পেনো ছোট, বাঁ দিকে পাস দে মির্জা ···নানান ধরনের চিৎকার।

বেশ খানিকক্ষণ পিলকিন'স ইলেভেন নেংটি নাচা নেচে শেষে নিজেদের সামলে নিল। তারপর শুরু হল বদুদার খেলা। এমন খেলা কেউ দেখেছে কি না জানি না। ভাওড়ার কোনও প্লেয়ার বল নিয়ে এগুতে গেলেই বদুদা তেড়ে যাচ্ছে চেঁচাতে-চেঁচাতে, কী বলছে শোনা যাচ্ছে না, কখনও যাত্রার পার্ট মুখস্থ বলছে, কখনও হুঙ্কার ছাড়ছে, কখনও খেপিয়ে দিচ্ছে। এরপর শুরু করল বদুদার মার। সিংগল কাঁচি, জোড়া কাঁচি, ছররা, ল্যাঙ, কনুইবাজি, হাঁটু-চোট, গরদানা—কত রকম কী মার আছে বদুদার, চোরা মার, সোজা মার, সবই মারতে লাগল। ধন্য রেফারি! অত মার, তবু চক্ষু দুটি বুজে রইল।

কতক্ষণ আর সহ্য করে মানুষ। শেষে ভাওড়া কোলিয়ারির জন্‌ বদুদাকে এমন এক গুপ্তি মারল যে মহিষাসুর বদুদা ছিলে-কাটা ধনুকের মতন ছিটকে গিয়ে সাইড লাইনে পড়ল। পড়ে আর উঠতে পারল না। কাঁধের কাছে হাড় সরে গেছে। বদুদা ছটফট করতে লাগল। রেফারি জন্‌কে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিল।

হাফ্‌-টাইমের পর আবার যখন খেলা শুরু হল তখন পিলকিন'স ইলেভেন মরি-বাঁচি করে লেগে পড়ল। ভাওড়াও কম যায় না। তারাও বারবার আছড়ে পড়তে লাগল পিলকিন'স ইলেভেনের গোলের ওপর।

চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে আমাদের গলা বসে গেল, বিশ-পঁচিশটা ভাঙা ছাতা হাটের দিকে উড়তে লাগল, আকাশে আবার কালো করে মেঘ জমে উঠল। তবু কিছু হল না। দু-পক্ষই লড়ে যেতে লাগল। ম্যাচ ড্র হল।

পরের দিন আবার খেলতে হবে। তাই নিয়ম ছিল।

পরের দিন যে আমরা হেরে যাব এ যেন সবাই বুঝে নিয়েছিল। শোনা গেল, ভাওড়া কোলিয়ারি বলে দিয়েছে,

খাটা খাটনি তো সবার লেগেই আছে! আমার স্বামীর অফিস, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ, আর আমার হাট-বাজার করা। তাই আমরা নিয়ম করে অন্তত হরলিক্‌স টুকু রোজ সবাই খাই।
হরলিক্‌স আমাদের পরিবারের সকলেরই সাথী।
হরলিক্‌স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের নতুন রূপে
piccadily Restaurant
KAMAL READYMADE
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
HTD-HMM-8072BEN

আসানসোলের বার্জ ছাড়া অন্য কোনও রেফারি মাঠে নামলে তারা খেলবে না, দল নিয়ে চলে যাবে।

পিলকিনসাহেব বললেন, "ঠিক আছে। বার্জকেই আনাব। তবে সে ফাইনালের খেলা খেলাবার জন্যে তৈরি ছিল। ঠিক আছে।"

পরের দিন অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন পিলকিনসাহেব। মাঠে টিম নামাবার সময় গোলকিপার হিসেবে নামিয়ে দিলেন অখিল সাহানাকে। অখিলদাকে দেখতে কোলাব্যাঙের মতন। বেঁটে, মোটা, গোল। মাথায় চুল নেই। মাসখানেক আগে তার বাবার শ্রাদ্ধ গিয়েছে।

অখিলদাকে নিয়ে কোলিয়ারসুদ্ধু সবাই মজা করত। নিজেও ভীষণ মজার মানুষ। হরদম মজা করে। ওই ব্যাঙের মতন চেহারা নিয়ে ডিগবাজি খায়, কখনও কখনও জোড়া ডিগবাজি। অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করে ভেঙচায়, থপ্ থপ্ করে জোড়া পায়ে লাফায়। আর অনবরত খিলখিল খকখক করে হাসতে পারে। তার হাসির কোনও মাথামুণ্ডু নেই।

অখিলদাকে জোকার বলা যায়, কিন্তু সে তো ফুটবল প্লেয়ার নয়। মাঠে এসে মজা করে এই যা! সেই অখিলদাকে গোলকিপার হিসেবে খেলতে নামালেন কেন পিলকিনসাহেব? মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি! নাকি সাহেব ধরেই নিয়েছেন, হারতে যখন হবেই তখন বৃথা লড়ালড়ি না করে মাঠে একটু তামাশাই করা যাক! কী জানি কী মনে ছিল ওঁর।

খেলা শুরুর আগে দেখি, কোলিয়ারির জনা-পাঁচেক ষণ্ডা গোছের লোক ঢাক, ভেঁপু, কাঁসর-ঘন্টা নিয়ে মাঠে এসে হাজির। সঙ্গে আরও চার পাঁচজন অতি বজ্জাত দামড়া গাঁয়ের লোক। ওদেরই শাকরেদ।

এবার পিলকিন'স ইলেভেনই মাঠে নামল প্রথমে। অখিলদার গায়ে লাল গেঞ্জি, মাথায় এক বাঁদুরে টুপি। নামল ডিগবাজি খেতে খেতে, জোকারদের মতন হাত-পা ছুঁড়ল, গড়াগড়ি দিল মাটিতে, আবার ডিগবাজি খেল। একে ওই ব্যাঙের মতন চেহারা, তার ওপর অমন বেশভূষা, আমরা তো হেসেই মরি। মাঠসুদ্ধু লোকের মজা লেগে গেল। হাসির ধুম।

তারপর দেখি, পিলকিন'স ইলেভেন যে দিকের গোল আগলাতে গেল, সেদিকে মাঠের ঠিক বাইরে গোল লাইন ঘেঁষে সেই ষণ্ডা গোছের লোকগুলো তাদের শাকরেদদের নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের হাতে ভেঁপু, কাঁধে ঝোলানো ঢাক, হাতে কাঁসর-ঘন্টা। অখিলদা বার-দুই ডিগবাজি খেল, সঙ্গে সঙ্গে ঢাক আর ভেঁপু বেজে উঠল। যেন নাচ প্র্যাকটিস হল বাজনার সঙ্গে।

ব্যাপারটা তখনও ভাল বুঝলাম না। মনে হল, একটা কিছু মতলব নিয়ে লোকগুলো এসেছে। কিন্তু কী যে মতলব বুঝতে পারলাম না।

খেলা শুরু হল।

ভাওড়া কোলিয়ারি যেন ঠিক করে নিয়েছিল আজ তারা প্রথম দিকে একটু গা আলগা করে খেলবে, খেলে পিলকিন'স ইলেভেনকে ধোঁকা দেবে, তারপর আচমকা লাফ মেরে টুঁটি চেপে ধরবে পিলকিনদের।

সেই ভাবেই খেলা শুরু হল। আমাদের কোলিয়ারি সাপের ফণা তোলার মতন করে ছুটে গেল ওদের পেনালটি এরিয়া পর্যন্ত। কিন্তু ছোবল বসাতে পারল না। হেলেসাপের মতন নেতিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটল। হঠাৎ দেখি সেই বানোয়ারিলাল বল নিয়ে পনপন করে ছুটে আসছে। কে তাকে আটকায়। দেখতে দেখতে আমাদের গোলের কাছে। এই বুঝি একটা দিল ঢুকিয়ে।

কিন্তু ও কী! আমাদের গোলকিপার অখিলদার কাণ্ড দেখেছ? বল নিয়ে বানোয়ারি ঝড়ের বেগে তেড়ে আসছে আর অখিলদা গোল লাইনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সার্কাসের ক্লাউনদের মতন ডিগবাজি খাচ্ছে। থপ্ থপ্ করে নাচছে। মুখের নানা রকম ভঙ্গি করছে। এ আবার কী!

বানোয়ারি গোলের কাছে শট নিতে যাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শব্দ করে ভেঁপু বেজে উঠল।

কেমন থমকে গেল বানোয়ারি, পায়ের বল পায়ের কাছেই পড়ে থাকল। সে চোখ তুলে অখিলদার ডিগবাজি খাওয়া আর নাচ দেখল। দেখে হেসে ফেলল। প্রথমে দমকা হাসি, তারপর হো-হো হাসি, শেষে পেট চেপে অট্টহাসি। আর একেবারে শেষে হাসতে হাসতে মাঠে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

ষণ্ডার দল যেন তাক খুঁজছিল। তারা ভেঁপু ঢাক, কাঁসর-ঘন্টা বাজাতে লাগল প্রাণপণে। সেই সঙ্গে নাচতে লাগল।

মাঠসুদ্ধু লোক খেলা দেখবে কী, তামাশা দেখে যেন হেসেই মরতে লাগল। হই-হই কাণ্ড লেগে গেল মাঠে।

রেফারি বার্জ খেলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "এসব কী? এটা খেলা না সার্কাস।"

পিলকিন বললেন, "আমার টিমের গোলকিপার যদি ডিগবাজি খায় তাতে হয়েছে কী? কোন্ আইনে আছে গোলি মাঠের মধ্যে ডিগবাজি খেতে পারবে না?"

বার্জ বললেন, "তোমার কোলিয়ারির লোকরা ওই সব বাজনা বাজাচ্ছে কেন? অন্য টিমের প্লেয়াররা গোলে শট নিতে পারছে না, ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাচ্ছে!"

পিলকিন বললেন, "মাঠের বাইরের লোক আমার টিম নয়। তারা পাবলিক। তারা বাজনা বাজাতে পারবে না, এমন কোনও আইন আছে?"

রেফারি বার্জের কাছে কোনও আইনের বই ছিল না। তা ছাড়া সেকালে কোলিয়ারির ম্যাচ খেলাতে কে আর আইনের বই দেখে রেফারি হয়েছে!

বার্জ বললেন, "হয় তোমাদের বাঁদরামি বন্ধ করো, না-হয় আমি খেলা বন্ধ রেখে চলে যাচ্ছি।"

পিলকিন খানিকটা ভেবে বললেন, "ঠিক আছে। আমার টিম ফেয়ার গেম্ খেলবে। খেলা শুরু করো।"

আবার খেলা শুরু হল।

তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না, পিলকিন'স ইলেভেন হঠাৎ কেমন ভদ্রলোক হয়ে গেল। আর গোনা-গুনতি বারোটা গোল খেয়ে মাঠের মধ্যেই শুয়ে পড়ল। লেমনেড পর্যন্ত খেল না।

ছবি : অনুপ রায়

জেতো!

প্রথম পুরস্কারঃ আমেরিকা ও জাপানের ডিজনীল্যাণ্ডে উড়ে যাতায়াতের সুযোগ!

দ্বিতীয় পুরস্কারঃ দারুণ সব স্পোর্টস বাইক!

প্রথম মেলা প্রবেশপত্রের পুরস্কার—প্রতি হপ্তাতেইঃ চমৎকার ডিজিটাল ওয়াচ

শিগ্‌গির! প্রতিযোগিতা বন্ধের তারিখ ১৪-ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

যোগ দাও

PARLE POPPINS

পপিন্স 'স্পেল-এ-প্রাইজ' কনটেস্টে

প্রবেশপত্রের ফর্ম মিলবে তোমার প্রিয় দোকানেই!

everest/85/PP/125-bn

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী সারা জীবনের মতো পঙ্গু। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় তাঁদের ছেলে সায়ন এখন চা-বাগানেই আছে। একটু আগেই একজোড়া সাপ মারা হয়েছে। বুধুয়া-বুড়ো তাতে অখুশি। কাছেপিঠে ডাকাতি হচ্ছে। রাত্রে দূরের পাহাড়ে সাংকেতিক আগুন দেখা যায়। আগুনের দাঁড়ি ও গুণচিহ্ন। তারপর···

রাতটা সুন্দর কেটে গেল। কোনও রকম চিৎকার চেঁচামেচি হয়নি, আতঙ্কিত মানুষের কাতর কান্না ওঠেনি, বাংলোর প্রত্যেকটা রাত যেমন কাটে, আজও তেমন কাটল। ঘুম ভাঙা মাত্র সায়ন এক ছুটে বেরিয়ে এল দোতলার বারান্দায়। সামনের পাহাড়টায় এখনও ছায়া, বেলা না পড়লে রোদ নামে না ওর বুকে। ঘন জঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি যায় না। কাল ঠিক কোনখানে আগুন জ্বলেছিল তা এতদূর থেকে ঠাহর করা অসম্ভব।

কাল রাত্রে বুধুয়া-বুড়ো যা বলেছিল সেটা ঠিক হলে এতক্ষণে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। কুসংস্কার ? বাবা ঠিকই বলেছেন বলে মনে হল ওর। অথচ রাত্রের ওইরকম গা-ছমছমে পরিবেশে কথাগুলো খুব সত্যি বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। তখন যতই যুক্তি দাও, সেটাকে মানতে মন চায় না। আজ সকালে দিনের আলোয় আবার উল্টোটা মনে হচ্ছে। কিছু ঘটলে কী হত বলা যায় না, তবে এখন বোধ হচ্ছে, সে মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল। হাওয়া কি কোনও প্রাণী যে, তার নখ গজাবে ? কী হাস্যকর।

এই সময় চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ কানে যেতেই সায়ন মুখ ফেরাল। কুমুদিনী হুইল-চেয়ার ঘুরিয়ে কাছে এলেন, "কাল রাত্রে খুব ভয় পেয়েছিলি, না ?"

"হুঁ। বুধুয়া-বুড়ো বলল কালসাপগুলো নাকি ক্ষমা করে না।"

"দূর বোকা ! কালসাপ শব্দটার মানে জানিস ? বুধুয়াও জানে না। কালসাপ খুব খারাপ অর্থে বলে। যে সাপ বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে হল কালসাপ। বুধুয়া বলতে চেয়েছে ও দুটো বাস্তুসাপ। যে সাপ দীর্ঘকাল বাড়িতে থাকে, তাকে পোষা জীবের মতো ধরে নিয়ে গ্রামের লোকেরা বলে বাস্তুসাপ। বুধুয়া তার ওপর অনেক মনগড়া কল্পনা চাপিয়ে তোকে শুনিয়েছে। যা, মুখ ধুয়ে আয়, তোর বাবার ফিরতে দেরি হবে।" কুমুদিনী ওপাশের ঘরে যাওয়ার জন্য চাকায় চাপ দিলেন।

"বাবা কোথায় গিয়েছে ?"

"ওমা, তুই জানিস না ?"

"না।"

"সত্যি, কী ঘুম তোর ! ডাকাত পড়লেও টের পাবি না। ভোর চারটের সময় খবর এল পাশের বাগানে ডাকাতি হচ্ছে। থানা থেকে খবর আসামাত্র তোর বাবা সবাইকে জাগিয়ে সাবধান করে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাহায্য করতে। সেই থেকে কেউ আর ঘুমোয়নি। আধ ঘণ্টা আগে তোর বাবা ফোন করেছিলেন ওখান থেকে। ডাকাতরা সুবিধে করতে পারেনি। পুলিশ এবং অন্যান্য বাগান থেকে সাহায্য পৌঁছে যাওয়ায় ওরা পালাতে বাধ্য হয়েছে। তোর বাবা মিটিং করছেন সবাইকে নিয়ে। শেষ হলেই চলে আসবেন।"

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ডাইনিং রুমে এল সায়ন। সকালবেলার এই খাওয়াটা তাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে খেতে হয়। যত রাজ্যের ভিটামিন আর শরীরে শক্তি বাড়াবার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন কুমুদিনী। যার স্বাদ খুবই খারাপ। অথচ খেতে হয়। কারণ, খাওয়ার সময় বকুল দাঁড়িয়ে থাকে সামনে।

খাবার যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন বকুল বলল, "আজ আমরা সাপের গর্ত খুঁড়ব, আর একটু রোদ উঠলেই।"

সায়ন অবাক হল, "গর্ত খুঁড়বে কেন ?"

"বাঃ, ও দুটো যদি কালসাপ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই ওদের গর্তে মণি লুকনো আছে। এখন গর্ত খুঁড়লেই..." তৃপ্তির হাসি হাসল বকুল। সায়ন দেখল, ওর চোখ-মুখে লোভ চকচক করছে।

"সাপের মণি পেলে কী হবে ?"

"সাপের মাথার মণি সাত রাজার ঐশ্বর্যের চেয়েও দামি।"

"কে নেবে মণিটা ?"

"কে নেবে ?" হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল বকুল, "তাতে তোমার কী দরকার ?"

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল সায়ন, "সাপের মাথায় কোনও কালেই মণি থাকে না। কুসংস্কার থেকেই মানুষ ওসব কথা ভাবে। তোমরা গর্ত খুঁড়লে একটা মরা খরগোশ ছাড়া আর কিছু পাবে না।"

লনে এসে দাঁড়াতেই ওর নজর গেল গর্ত তিনটের দিকে। তারপরেই সে পাহাড়টার দিকে তাকাল। চকিতে একটা চিন্তা তার মাথার মধ্যে পাক খেয়ে গেল। গতকাল রাত্রে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে কেউ সংকেত পাঠায়নি তো ? একটা ইংরেজি রহস্য-উপন্যাসে সে এইরকম ঘটনার কথাই পড়েছিল। সেই সংকেতকে বুধুয়া-বুড়ো কুসংস্কারের চোখে দেখেছিল, আর যাদের উদ্দেশে ওই আগুন জ্বালা হয়েছিল, তারা ঠিক মানে বুঝে নিয়ে ভোররাত্রে ডাকাতিতে বেরিয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা যত ভাবছিল, তত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল সায়ন। সেই ইংরেজি উপন্যাসের মতো হুবহু ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে তার মাথায়। কথাটা এক্ষুনি বাবাকে বলা দরকার। আগুনটা যদি সংকেত না হয়, তা হলে ভোরে ডাকাতি হতে যাবে কেন ?

কিন্তু সায়ন জানে, যাকেই সে এই সন্দেহের কথা বলবে, সে বিশ্বাস করবে না। বাবা বলবে, আজেবাজে বই পড়ে মাথাটা গেছে। এখানকার ডাকাতরা ক্রাইম ফিকশন পড়ে না

"মা, আমিও পরেছি"

Duckback®

গ্লেজড্ গামবুট - ছোট বড় সবার জন্য

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

সবার সুরক্ষায় Duckback®

naa BWL-8475

যে, তোর ধারণামতো কাজ করবে।

অর্জুন লন পেরিয়ে বাংলোর পেছনে চলে আসতেই বুধুয়া-বুড়োকে দেখতে পেল। নীলাম্বরকে দু'হাতে আদর করছে বুধুয়া-বুড়ো। ওর উচ্ছ্বাস ঠিক ছেলেমানুষের মতন। নীলাম্বরটাও বুধুয়ার কাঁধে মুখ ঘষছিল, হঠাৎ সায়নের ওপর নজর পড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। নীলাম্বরের পরিবর্তন লক্ষ করে বুধুয়া-বুড়ো পেছন ফিরে তাকাতেই সায়নকে দেখতে পেল। তারপর খানিকটা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, "ফাঁড়া কেটেছে। কালসাপের রাগ আমাদের বদলে পাশের বাগানে জ্বলেছে। সেখানে ডাকাতি হয়েছে। আমরা বাঁচলাম।"

সায়নের মাথায় আর-একটা মতলব খেলে গেল। ওই আগুনের চিহ্নগুলো বুধুয়া-বুড়ো চেনে। কী করে চিনল, সেটা জানতে হবে। সে কাছে এসে বলল, "তুমি প্রার্থনা করলে বলে আমরা বেঁচে গেলাম বুড়ো। তুমি সত্যিকারের ভালমানুষ।"

বুধুয়া-বুড়ো বলল, "ছোটাসাহেব, মনিবের জন্যে প্রাণ দিতে পারি আমি, কিন্তু মনিব যখন বুঝতে চায় না তখন বড় কষ্ট হয়।"

সায়ন আর-একটু কাছে এগিয়ে এল, "তুমি ওই আগুনের চিহ্ন বুঝতে পেরেছিলে, না?"

"বাঃ, বুঝতে পারব না?" চোখ বন্ধ করে দুটো হাত মাথায় ঠেকিয়ে কাউকে নমস্কার জানিয়ে নিল বুধুয়া-বুড়ো, "ওগুলো হল অমঙ্গলের চিহ্ন। আমার বুড়ো বাপ আমাকে শিখিয়েছিল। তাকে শিখিয়েছিল তার বুড়ো বাপ। ওসব হল শয়তানের পায়ের ছাপ। একমাত্র বোঙ্গার কৃপা না হলে ওই ছাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।"

সায়ন যেন একটা হদিস পাচ্ছিল, "ওই চিহ্নের মানে আর কে কে জানে?"

বুধুয়া-বুড়ো মাথা নাড়ল, "বেশি লোক আর খবর রাখে না। আজকালকার ছেলেরা তো ভগবানেই বিশ্বাস করে না, শয়তান তো অনেক দূর! কিন্তু আমার মতো বুড়ো-বুড়িরা ঠিক খবর রাখে। ডাইন যখন কারও অমঙ্গল চায় তখন ওই চিহ্ন আঁকে।"

"এইরকম চিহ্ন কতগুলো তোমার জানা আছে?"

"চার রকম। চার রকমের বেশি নেই তো।"

"আমাকে দেখিয়ে দেবে চিহ্নগুলো?"

"কেন? তোমার কী দরকার?" সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল বুধুয়া-বুড়ো।

"আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, শয়তানেও। তাই ওইসব চিহ্ন জানতে চাই। তোমরা যখন পৃথিবীতে থাকবে না, তখন কারও-কারও তো এইসব কথা জেনে রাখা উচিত। তা ছাড়া তোমাকে আমি আর-একটা খবর দিতে পারি।"

চোখ ছোট হয়ে এল বুধুয়া-বুড়োর, "কী খবর?"

"তোমার কালসাপের গর্ত খুঁড়ে মণি বের করে নিতে চাইছে বকুল।"

কথাটা শোনামাত্র বুধুয়ার মুখচোখ পাল্টে গেল। চোখ থেকে আগুন বের হতে লাগল যেন। তাকে দেখে সায়নেরই ভয় লেগে গেল। সে কোনও রকমে বলল, "রাগ কোরো না বুধুয়া-বুড়ো। বাবা বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত কেউ গর্ত খুঁড়বে না। আমি মাকে বলব যাতে তোমার কথা বকুল শোনে।"

বুধুয়া যেন একটু শান্ত হল, "ওই গর্ত কেউ খুঁড়বে না।

কালসাপের আত্মা আবার ওখানে দেহ নেবে। ওর মণি ওর নিজেরই থাকবে। যদি তোমার মা-বাবা বকুলকে বাধা না দেয়, তা হলে সে মারা যাবে।"

সায়ন বুধুয়া-বুড়োর হাত ধরল, "এ কথাও আমি বকুলকে বলে দেব, যাতে সে তোমার কথা শোনে। তোমার রাগ কমেছে?"

বুধুয়া-বুড়ো এবার নীলাম্বরের পাশে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। তার শরীর থেকে মাত্র এক হাত দূরেই নীলাম্বরের ছটফটে পা। মাথায় সাদা কাশের মতো চুল, কোঁচকানো চামড়ার মুখ দু'হাতে ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল বুধুয়া-বুড়ো। তারপর নিরীহ গলায় বলল, "আমি কি আমার জন্যে চিন্তা করি? আমার ছেলেমেয়ে নেই, বউ নেই। পৃথিবীতে আমি একা। তোমাদের এই বাংলোয় আমি তিনকুড়ি বছর কাটিয়ে দিয়েছি। তোমার বাবাকে জন্মাতে দেখেছি। তার বাবাকে দেখেছি, তার বাবাকেও। তোমাদের কেউ ক্ষতি করুক আমি চাই না। যে কবরে পা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার নিজের জন্যে কী দরকার বলো? ছোটাসাহেব, জীবনে কারও ক্ষতি কখনও কোরো না, দেখবে ভগবান তোমার ক্ষতি হতে দেবে না।"

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

সায়ন এবার বুধুয়া-বুড়োর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, "তুমি আমাকে চিহ্নগুলো দেখালে না ?"

বুধুয়া-বুড়ো খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সায়নের মুখের দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে নীলাম্বরের অব্যবহৃত একটা নাল তুলে নিল ডান হাতে। বাঁ হাতে একটা কাঠি নিয়ে মাটির ওপর দাগ কাটল। সায়ন দেখল একপাশে একটা দাঁড়ি, অন্য পাশে দুটো। বুধুয়া-বুড়ো বলল, "এর মানে, একটা বাধা সামনে দাঁড়ালে ডবল হয়ে খতম করো।" ব্যাখ্যা করে ঘোড়ার নালটা ছোঁয়াল বুধুয়া-বুড়ো। তারপর একটা বৃত্ত এঁকে মাঝখানে তিনটে দাঁড়ি আঁকলো। "এইটে হল : পাপ ঘিরে ধরেছে, এখন পুড়িয়ে মারলেই হল।" আবার ঘোড়ার নাল ছুঁইয়ে বুধুয়া-বুড়ো বলল, "এর মানে হল, ভগবান আসছে, পালাও।"

সায়ন দেখল, বুধুয়া মাটিতে একটা লম্বা দাঁড়ি এঁকে তার মাথায় যে দাগ কেটেছে, তাতে ইংরেজি টি হয়ে গেল। তারপরেই ঘোড়ার নাল ঘষে চিহ্নটাকে মুছে ফেলতে লাগল বুধুয়া-বুড়ো। এই ব্যাপারটা প্রথম থেকে লক্ষ করছিল সায়ন। সব জানা হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি নালটা দিয়ে প্রতিবার অমন করছ কেন ?"

বুধুয়া-বুড়োর যেন হুঁশ ফিরল। নালটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল সে, "এই সব চিহ্ন বড় অমঙ্গলের। এই বাংলোর জমিতে আমি আঁকলাম তো, কুলগাছের কাঁটা আর ঘোড়ার নালই পারে ওই অমঙ্গলের মাথায় ঝাড়ু মারতে।"

সারাটা দিন কাটল, যেমন অন্যান্য দিন কাটে। সুপ্রকাশ ফিরেছিলেন শান্ত হয়ে। পুলিশসুপার কথা দিয়েছেন হাইওয়ে-ডাকাতদের যেমন করেই হোক রুখবেন। ভুটানের রাজার কাছে চিঠি দেওয়ার জন্যে তিনি ভারত-সরকারকে অনুরোধ করবেন, যাতে অপরাধীরা সেখানে পালিয়ে গেলেও ধরা যায়। এছাড়া এই তল্লাটের সবক'টা চা-বাগানের মালিক এবং ম্যানেজাররা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, একটি প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই বাহিনী চা-বাগান এলাকায় অপরাধী ধরতে পুলিশের সঙ্গে হাত মেলাবে। মুশকিল হল, এই অপরাধীরা কারা, সেটাই ঠাহর করা যাচ্ছে না। সাধারণ শ্রমিক বা স্থানীয় গুণ্ডা-বদমাশ এতটা সাহসী কখনও হতে পারে না। চা-বাগানের ম্যানেজার বা মালিকদের সম্পর্কে তাদের পুরুষানুক্রমে কিছুটা ভীতি আছেই।

খাবার খেয়ে সুপ্রকাশ যখন আবার বাগানে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন, সায়ন তাঁকে সাপের গর্তগুলোর কথা বলল। বকুল চায় গর্ত খুঁড়তে, আর বুধুয়া-বুড়ো তার বিপক্ষে। সুপ্রকাশ বললেন, "গর্ত খুঁড়ে কী হবে ? ওতে তো অ্যাসিড দেওয়া হয়েছে, সাপ আর থাকতেই পারে না।"

সায়ন নিরীহ গলায় বলল, "বকুল বলছে, গর্তের ভেতরে সাপের মণি আছে।"

হাঁ হয়ে গেলেন সুপ্রকাশ, "ইডিয়ট !" তারপর একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি এইসব গপ্পে বিশ্বাস করো ?"

দ্রুত মাথা নাড়ল সায়ন, না। হাসি ফুটল সুপ্রকাশের মুখে, "গুড। অন্ধ কুসংস্কারকে একদম প্রশ্রয় দেবে না। গর্ত খোঁড়ার দরকার নেই। আমি নিষেধ করেছি বলে দিও।"

সুপ্রকাশ গাড়ি নিলেন না। নীলাম্বরের পিঠে চেপে চা-বাগানের কাজ দেখতে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল সায়ন। বুধুয়া-বুড়ো তখন বাগানের ভেতরে পাথরটার ওপর বসে ঝিমোচ্ছিল। সায়ন উত্তেজিত গলায় বলল, "বুধুয়া-বুড়ো, তোমার কালসাপের গর্ত কেউ খুঁড়বে না। বাবা নিষেধ করে দিয়েছে।"

বুধুয়া-বুড়ো মাথা নাড়ল, "চারধারে অমঙ্গল চিহ্ন ছোটা সাহেব। কিন্তু তবু ভগবান বড়সাহেবের ভাল করুন। না হলে বকুলের হাত কাটতাম আমি।"

আর একটু বেলা বাড়লে, সূর্যদেব মাথার ওপর থেকে সামান্য ঢললে সায়ন বুধুয়া-বুড়োর সঙ্গী হল। বাংলোর কাজকর্ম করার জন্যে অনেক লোক আছে, বুধুয়া-বুড়োর বয়স হয়েছে বলে কোনও কাজই তাকে ধরাবাঁধা করতে হয় না। কিন্তু সারাদিনে একবার কাটারি আর বস্তা কাঁধে সে বের হবেই। নীলাম্বরকে নিজের হাতে কাটা ঘাস না খাওয়ালে তার স্বস্তি হয় না।

এই সময় কুমুদিনী দিবানিদ্রায় যান। সারাদিন বদ্ধ জায়গায় হুইল-চেয়ারে ঘোরেন মহিলা। কখনও তাঁর খেয়াল হলে ধরাধরি করে নীচের লনে নামানো হয়। দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুপ্রকাশ বেরিয়ে গেলে কুমুদিনী বিছানায় যান। এই সময়টুকু সায়নের ওপর পাহারাদারি করার কেউ থাকে না। এই অসময়ে বুধুয়া-বুড়োর সঙ্গে সায়ন বেরিয়ে যাচ্ছে বাংলো থেকে, দৃশ্যটা বকুলের চোখে পড়লে কামান দাগত। সাহেবের ছেলে একটা কুলি-বুড়োর সঙ্গে ঘাস কাটতে যাচ্ছে—ছি ছি ছি। কিন্তু সুপ্রকাশের হুকুম শোনার পর বকুলের খুব রাগ হয়েছে। কিচেনে সে বসে আছে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে। অতএব পাহারা দেবার কেউ নেই।

শিরীষ গাছের ছায়ায় বুধুয়া-বুড়োর সঙ্গে কিছুটা পথ হাঁটার পর সায়ন পাহাড়টাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। সবুজ গাছে ছেয়ে আছে সামনেটা। মাঝে-মাঝে যেখানটা ন্যাড়া, সেখানে সাদাটে পাথর রোদে চমকাচ্ছে। সায়ন বুধুয়া-বুড়োকে বলল, "ওই পাহাড়ে যাবে তুমি ? ওখানে নিশ্চয়ই ভাল ঘাস আছে।"

চটজলদি ঘাড় নাড়ল বুধুয়া-বুড়ো, "না, না ! ও পাহাড়ে শয়তান আছে। খবরদার, ওইদিকে যাওয়ার মতলব কোরো না।"

"তুমি শয়তানকে নিজের চোখে দেখেছ ?"

"হুম্ !" বুধুয়া-বুড়ো সামান্য ছায়া দেখে ঘাস কাটতে বসে গেল।

"দেখেছ ?"

"হুম্।" কাটারি চলছে দ্রুত হাতে। কচাকচ ঘাস টুকরো হচ্ছে।

"কেমন দেখতে শয়তান ?" সায়নের চোখ বিস্ফারিত।

"ঠিক শয়তানের মতন। তোমার আমার মতন নয়। তবে হ্যাঁ, কখনও-কখনও বকুলের চেহারায় শয়তান ঢুকে পড়ে।"

সায়ন হেসে ফেলল, "বকুলের ওপর তোমার খুব রাগ, না ?"

ফুঁসে উঠল বুধুয়া-বুড়ো, "শয়তান না ঢুকলে গর্ত খোঁড়ার কথা কেউ বলে ?"

সায়ন আর-একটা ঠাট্টা করার জন্যে মুখ তুলতেই হতভম্ব হয়ে গেল। দূরে ধুলোর ঝড় তুলে কেউ বা কিছু ছুটে যাচ্ছে। পাহাড়ের দিকে। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

অন্য কোনও নামে নেই তো ? এই যেমন রামন জারাতে ?
কী রকম দেখতে বলুন তো ?
এঁকে দেখাচ্ছি। লম্বা থুতনি, ছোট গোঁফ, হট্টাকট্টা চেহারা । অনেকটা এইরকম ।...
এইরকম কেউ আছেন ?
না সার্, এমন কেউ এখানে নেই ।
আচ্ছা, ধন্যবাদ ।
BRIST
হাঁদাটার মনিব্যাগ এখন ফেরত দেব কী করে ?
তাই তো ভাবছি ।
মনিব্যাগটার মধ্যেও তো কোনও হদিস থাকতে পারে । চলো, কোথাও বসে এটা খুলে দেখা যাক ।
কী খাব ? হুম...
আইসক্রিম সোডা ।
এবারে দেখা যাক, কী আছে ।
ROSSINI
হরেক দেশের নোট আর খুচরো... লটারির টিকিট...মেপল-পাতা...
CARLTON HOTEL
বিমানের ফোটোও দেখছি কয়েকটা...
একটা চিঠিও রয়েছে । পড়া যাক ।
শুক্রবার
প্রিয় মহাশয়,
দশটা থেকে বারোটার মধ্যে পি· আই· সি· ৮৫২৪ নম্বরে টেলিফোন করে মিঃ দেব্রেকে ডেকে দিতে বলুন । ধন্যবাদ ।
জে·ডি·এম·সি·
জেনারেলের ঠিকানা তো নেই !
জানি । কিন্তু এই নম্বরে আমি ফোন করব ।
ROSSINI
হ্যালো...পি আই সি ৮৫২৪ ? ...মিঃ দেব্রের সঙ্গে কথা বলব । ...আমি জেনারেল আলকাজারের বন্ধু...হ্যালো...হ্যালো...

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

রোভার্সের খেলোয়াড়দের কে বিপদে ফেলতে চাইছে ?

ক্রিটে বেড়াতে এসেছে রোভার্সের খেলোয়াড়রা। সেখানে এক অজ্ঞাত শত্রু তাদের বিপদে ফেলতে চাইছে। স্ট্যামব্রিজের সঙ্গে খেলায় রোভার্স জিতেছে।

কী মজা ! কী মজা ! ফুটবলের চেয়ে এ-খেলা অনেক ভাল !

শত্রু এখনও হাল ছাড়েনি...

দ্যাখো, কী তোমার সামনে !

আবার ফুটবল !

রয় ভারসাম্য রাখতে পারল না !

যাচ্চলে !

যাঃ !

জল ঝাঁপিয়ে তীরে উঠে এল ওরা...

বলটা ফেরত পাব রয় ?

ওল্ডফিল্ডের খেলোয়াড় ! পরের দিনই রোভার্সের শেষ খেলা...ওল্ডফিল্ডের সঙ্গে...

আমরা প্র্যাকটিস করছিলুম !

ট্রফিটা আমরাই পাব !

তা হলে তো আরও প্র্যাকটিস চাই !

বলের সঙ্গে জলও নাও !

যাচ্চলে !

কী কাণ্ড

জল ছিটিয়ে পালিয়ে এল রয় আর জিমি...

কাল মজা দেখাব !

সেটা কাল বোঝা যাবে!

ছেলেগুলো কিন্তু বেশ রগুড়ে !

রোভার্স আর ওল্ডফিল্ডের ম্যাচটা হবে সাইক্রো বলে একটা জায়গায়···

ওর কাছেই শুনেছি ডিকটাইনের বিখ্যাত গুহা !

খেলার শেষে গুহাটা দেখবে ?

ভালই তো !

রোভার্সের স্থানীয় পরিচারক নিকোস লিদাকিস···

গুহাটা আমিই আপনাদের দেখিয়ে দেব ।

গাইডের দরকার নেই ?

আমার চেয়ে ভাল গাইড পাবেন না ।

ঠিক হল, নিকোসই গাইড হবে !

ম্যাচের শেষে ট্রোফি নিয়ে পাহাড়-চূড়োয় উঠব ।

ট্রোফিটা আগে পাই তো !

রোভার্সের খেলোয়াড়রা সাইক্রোতে যাচ্ছে···

এ যে একেবারে পাহাড়ি এলাকা !

ওই হল খেলার মাঠ !

রয় মাঠ পরীক্ষা করছে !

বাব্বা, কাঁকুরে কঠিন মাটি ! ঘাস তো নেই বললেই হয় !

তবু আমরাই জিতব !

রয় কিন্তু নিশ্চিন্ত নয় !

এ-মাঠে ট্রেনিং বুট পরে খেলাই ভাল !

খেলতে নেমেই গোল দেব !

যা বলেছ !

ওল্ডফিল্ড কিন্তু সহজে ছাড়বে না···

ওরা দেখছি কেডস পরে খেলছে । হাল্কা জুতোয় সুবিধে পাবে ।

ঠিক কথা···

যাচ্চলে !

রোভার্সের তুলনায় ওল্ডফিল্ডের গতি অনেক দ্রুত !

রয় এখন কী করবে ?

এবারে কী ঘটবে জানো ? অনেক বিস্ময় জমা হয়ে আছে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ভিতর থেকে হঠাৎ একটা আর্তনাদ ভেসে এল

রাত তখন বারোটা

সুব্রত নিয়োগী

বুড়্ঢাদা ভূত বিশ্বাস করে না। ভূতের কথা কেউ তুললে ঠা-ঠা করে হেসে ওঠে। মানে ঠাট্টা করে হেসে ওঠে। বুড়্ঢাদার মতে ভূত মানেই নাকি ইলিউশন—চোখের বিভ্রম। সোজা কথায় চোখের ভুল। চাঁদের আলোয় বাঁশঝাড়ের মাথায় লেগে-থাকা সাদা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, নিঝুম রাতে ছাদের আলসেতে পড়ে-থাকা মাদুরের ছেঁড়া টুকরোর বাতাস লেগে শব্দ করে হঠাৎ-হঠাৎ নড়ে-ওঠা, অন্ধকারে তারে শুকোতে দেওয়া সাদা ধুতি—এসবই নাকি মানুষের চোখে ইলিউশন তৈরি করে। মানুষ ভূত দ্যাখে।

কিন্তু সেবার ছোটমাসির মেয়ে রুমাদির বিয়ের সময় জলপাইগুড়িতে যে কাণ্ড ঘটেছিল, তারপর থেকে বুড়্ঢাদার অন্তত ভূতকে অবিশ্বাস করার আগে একবার ঢোঁক গিলতেই হবে।

জলপাইগুড়িতে ছোটমাসির বাড়ির পেছনেই জেলা হাসপাতাল। হাসপাতালের পেছন দিকে আর মাসির বাড়ির মাঝখানে কিছুটা খোলা জমি। ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে ভরা। তারই ভেতর একটা ছোট্ট ঘর। ঘরের মাথায় অ্যাসবেস্টাসের ছাদ। ঘরের দরজায় সব সময় বাইরে থেকে তালা লাগানো থাকে।

কোনওদিন কাউকে ও-ঘরে ঢুকতে বা ঘর থেকে বেরুতে দেখিনি। ছোটমাসির বাড়ির ছাদ থেকে ঘরটা দেখা যায়। ঘরের একমাত্র জানলাও বন্ধ থাকে সারাদিন। আমরা সেবারের ঘটনার আগে পর্যন্ত জানতাম না কিসের ঘর ওটা। ওদিকে কেউ গেলে ছোটমেসো খুব রাগ করতেন।

সেবার রুমাদির বিয়েতে আমরা সবাই ওখানে গিয়েছিলাম। এদিকে সামপানদা ও বুড়্ঢাদাও গিয়ে হাজির। বুড়্ঢাদার যাবার কথা ছিল। কিন্তু বুড়্ঢাদা যে শেষ মুহূর্তে সত্যি-সত্যি গিয়ে হাজির হবে ভাবিনি। কারণ বুড়্ঢাদার ব্যাঙ্কের ইয়ার ক্লোজিং ছিল। বুড়্ঢাদা বলেই দিয়েছিল—সে আসতে পারবে না।

বুড়্ঢাদাকে পেয়ে দারুণ ভাল লাগল আমাদের। ছোটমেসোও বুড়্ঢাদাকে পেয়ে ভারী খুশি। বর আনতে যাবে বুড়্ঢাদা। কাঁচা বাজার করবে বুড়্ঢাদা। সানাইঅলা ঠিক করবে বুড়্ঢাদা। বিয়ের দিন মিষ্টির ভাঁড়ার আগলাবে বুড়্ঢাদা।

বিয়ের দিন সকাল থেকেই ভাঁড়ারঘরের সামনে দরজায় তালা লাগিয়ে দরজার সামনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে বুড়্ঢাদা। কখনও-সখনও আমাদের ছোটদের হাতে দু'-একটা রসগোল্লা তুলে দিচ্ছিল বুড়্ঢাদা। এক সময় আমার হাতে একটা রসগোল্লা তুলে দিয়ে বলল, "আমার দিকে পেছন ফিরে চট্ করে খেয়ে নে কাবুল—দেখিস কেউ যেন দেখে না ফেলে।"

পেছন ফিরে বুড়্ঢাদার দেওয়া রসগোল্লা মুখে পুরতেই ও হরি, দেখি, সামপানদা ড্যাবড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কাছাকাছি কেউ কোথাও ছিল না, হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে সামপানদা এসে হাজির। আমার মুখে রসগোল্লা ছিল বলে আমি কোনও কথা বলতে পারছিলাম না। সামপানদা এক দৌড়ে বুড়্ঢাদার কাছে গিয়ে একটা রসগোল্লা চাইতেই রেগে গেল বুড়্ঢাদা। বলল, "ছিঃ, সামপান,তুই ওদের চেয়ে বড় না!"

সামপানদা কেমন যেন মুষড়ে পড়ল। রেগে গেলও খুব। সারাদিন গুম হয়ে রইল। কারুর সঙ্গে কথা বলল না।

আমি সামপানদাকে বললাম, "তুমি বুড়্ঢাদার উপর শুধু-শুধু রেগে যাচ্ছ। বুড়্ঢাদার উপর এত বড় দায়িত্ব দিয়েছে

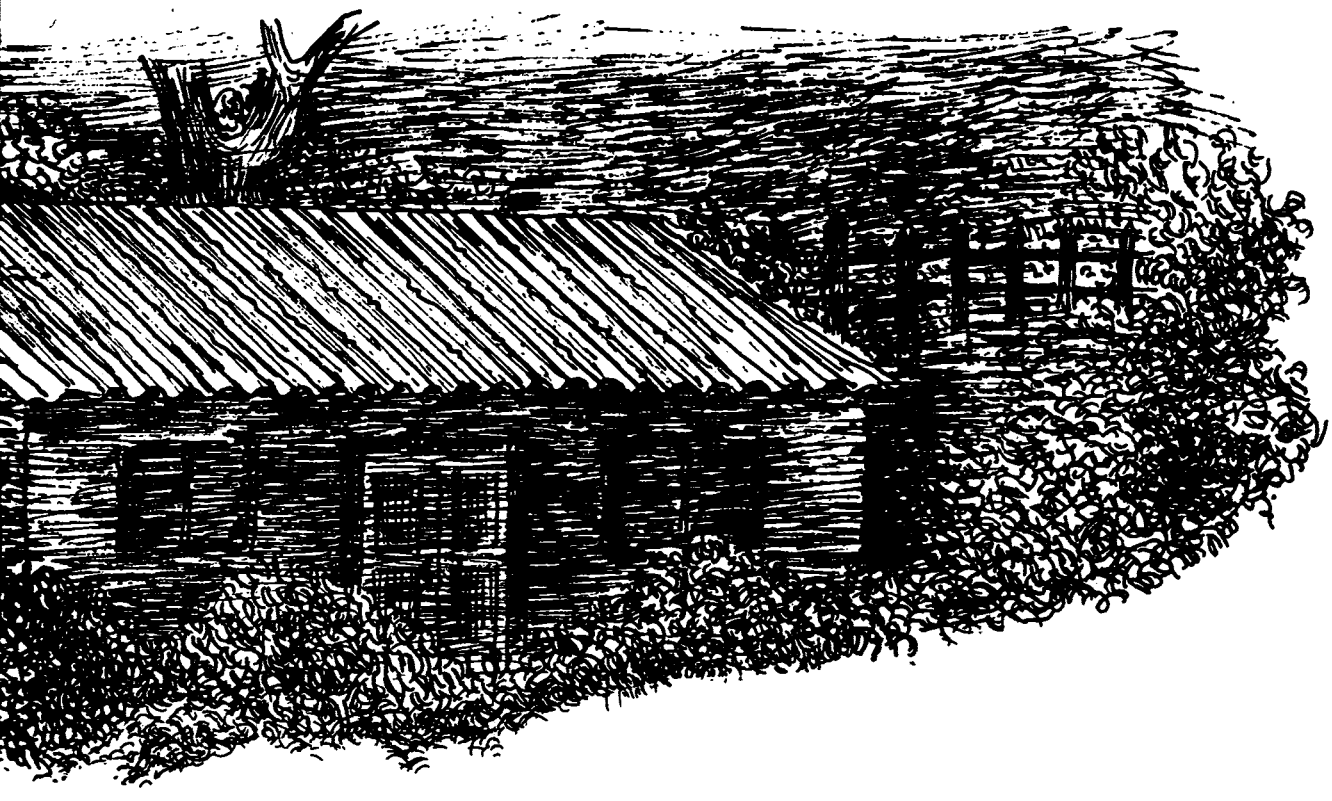

ছোটমেসো। পরে যদি মিষ্টি কম পড়ে যায়।"

সামপানদা ধমকে উঠে বলল, "তুই চুপ কর তো কাবুল, আমাকে একটা রসগোল্লা দিলেই কম পড়ে যেত, না?"

রুমাদির বিয়ে শেষ হলে আমরা কয়েকজন অনেক রাত্রে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমি, বুড়্ঢাদা আর সামপানদা এক বিছানায়। পাশের খাটে মুন্নি আর রুমাদির ছোট বোন ঝুমা। সামপানদা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। কথা বলছে না কারুর সঙ্গে।

শীতের রাত্রি। জলপাইগুড়িতে শীতকালে খুব কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে। বিছানায় লেপের নীচে শুয়ে বুড়্ঢাদা দারুণ-দারুণ সব তাক-লাগানো গল্প বলছিল।

আমি বললাম, "বুড়্ঢাদা, তুমি একটা ভূতের গল্প বলো। শীতের রাত্রে লেপের নীচে শুয়ে ভূতের গল্প শুনতে বেশ লাগে।"

পাশের খাট থেকে ঝুমা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। বলে, "না, বুড়্ঢাদা, ভূত-টুত নয়।"

এক সময় বুড়্ঢাদা বলল, "জেলা হাসপাতালের পেছনে জঙ্গলের ভেতর যে তালা-লাগানো অ্যাসবেস্টসের ঘরটা আছে, সেটা কী জানিস তোরা?"

বুড়্ঢাদা নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা শুরু করতেই শরীর শিরশির করে উঠল। বুড়্ঢাদা তো ভূত বিশ্বাস করে না, তবে কি শেষ পর্যন্ত ভূতের গল্প শুরু করবে বুড়্ঢাদা।

আমরা সবাই একসঙ্গে বললাম, "কই, জানি না তো।"

কেবল সামপানদা কোনও কথা বলল না।

সামপানদা কোনও কথা বলছে না দেখে বুড়্ঢাদা বলল, "কী রে সামপান, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

সামপানদা আলগোছে বলল, "না, ঘুমোইনি।"

সামপানদার সাড়া পেয়ে বুড়্ঢাদা প্রবল উৎসাহে বলে ওঠে, "ওটা একটা মর্গ।"

মুন্নি প্রায় ডুকরে উঠে বলল, "ওমা সে কী!"

বুড়্ঢাদা বলল, "হ্যাঁ, হাসপাতালের মর্গ, তোরা তো কতবার এসেছিস এখানে, জানতিস? ঝুমা তো এখানেই থাকে ও-ও জানে না।"

আমি বললাম, "উরেব্বাস, এখন যদি ওখানে কেউ একা-একা যেতে বলে, আমি লাখ টাকা দিলেও যাব না।"

বুড়্ঢাদা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "আমাকে কী দিবি বল, আমি এই মুহূর্তে ওই মর্গে যেতে পারি।"

ঝুমা বলল, "এই এত রাত্রে!"

বুড়্ঢাদা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে।"

সামপানদা অনেকক্ষণ পরে কথা বলল এবার, "যা যা, মুরোদ বোঝা গেছে।"

বুড়্ঢাদা বলল, "যেতে পারলে ক্রিকেট টেস্টের যে কমপ্লিমেন্টারি টিকিটটা পেয়েছিস আমাকে দিয়ে দিবি বল—অনেকদিন ক্লাব হাউসে বসে খেলা দেখিনি।"

সামপানদা বলল, "ঠিক আছে তাই দেব, তবে আজ নয়, যদি তুই কাল রাত বারোটার সময় ওই মর্গে ঢুকতে পারিস, তবেই পাবি।"

মুন্নি বলল, "যদি কোনও লাশ থাকে ঘরে?"

বুড়্ঢাদা বলল, "থাকতেই পারে, আজকে সকালেই তো একটা লাশ ঢোকাতে দেখেছি ঘরে। সাদা চাদরে মাথা পর্যন্ত ঢাকা তার শরীর। শুনেছি, প্রতিদিনই প্রায় দু-একটা লাশ থাকে ওই মর্গে।

আমি বললাম, "বুড়্ঢাদা, তুমি সত্যি ওই মর্গে ঢুকতে পারবে ?"

বুড়্ঢাদা গর্বের ভঙ্গিতে বলল, "শুধু মর্গে ঢোকা নয়, মর্গে ঢুকে লাশ থাকলে লাশের মুখে রসগোল্লা দিয়েও আসতে পারি।"

মুন্নি বলল, "ভূত-টুত নিয়ে ইয়ার্কি মেরো না বুড়্ঢাদা।"

সামপানদা বলল, "তবে ওই কথাই রইল বুড়্ঢা, কাল রাত্রি ঠিক বারোটায় জেলখানার পেটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বারোটা বাজলে হাসপাতালের ওই মর্গে ঢুকে যদি লাশের মুখে রসগোল্লা দিয়ে আসতে পারিস, তবে ওই কমপ্লিমেন্টারি টিকিটটা তোর।"

বুড়্ঢাদা বলল, "ঠিক আছে, তাই হবে।"

আমি বললাম, "যদি ঘরে কোনও লাশ না থাকে ?"

সামপানদা বলল, "তা হলে মেঝের ওপর রসগোল্লাটা রেখে আসবে বুড়্ঢা। তবে একটা শর্ত আছে।"

বুড়্ঢাদা বলল, "কী শর্ত আবার !"

সামপানদা বলল, "সঙ্গে টর্চ নেওয়া চলবে না। শুধু একটা প্রদীপের আলো অথবা মোমবাতি।"

বুড়্ঢাদা পুরাণের ঋষিদের ভঙ্গিতে বলল, "তথাস্তু।"

ঝুমা বলল, "আমরা কী করে জানব বুড়্ঢাদা ঘরে ঢুকেছিল।"

আমি বললাম, "আমরা পরের দিন ভোরে গিয়ে দেখে আসব।"

মুন্নি বলল, "বুড়্ঢাদা, মর্গের চাবি কোথায় পাবে তুমি ?"

বুড়্ঢাদা বলল, "হাসপাতালের ডোম ছিরুকে বলে চাবি যোগাড় করা যাবে। সকালবেলা ওর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে আমার।"

ঝুমা বলল, "হ্যাঁ, ছিরু ডোম তো বিয়েবাড়িতে খেয়েও গিয়েছে, আমি দেখেছি।"

বুড়্ঢাদা বলল, "আমি রাত্রে ছিরু ডোমের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসে মর্গের দরজার তালা খুলব।"

সামপানদা বলল, "ঠিক আছে, তবে এবার ঘুমনো যাক। যদিও আমি কাল সন্ধে থেকে থাকব না। শিলিগুড়িতে রুমার শ্বশুরবাড়িতে বিয়েতে পাওয়া ফার্নিচার টেম্পো করে পৌঁছে দিতে যেতে হবে। তবে ন'টা-দশটা নাগাদ ফিরে আসব নিশ্চয়ই।"

আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। বুড়্ঢাদা মাঝে-মাঝে এমন গোঁয়ার্তুমি করে যে কী বলব। আগামী কালের রাতের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত বারোটার আগে থেকেই আমরা উত্তেজনায় টগবগ করছি। বুড়্ঢাদাকে সন্ধে থেকে দেখছি না। সামপানদা রুমাদির শ্বশুরবাড়ি থেকে এখনও ফেরেনি। বুড়্ঢাদাই বা কোথায় !

সারা বাড়িতে আজ হৈ-হৈ কাণ্ড। ঘরে ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো ঝলমল করছে। কাল রুমাদির বউভাত। বড়রা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করছে। মা-মাসিমারা কাল কী শাড়ি পরে বউভাতে যাবে সে সব নিয়ে কথাবার্তা বলছে।

আমি, মুন্নি আর ঝুমা ছোটমাসির বাড়ির ছাদে ছুটে চলে গেছি সোজা। সেখান থেকে পলক না ফেলে মর্গের দিকে তাকিয়ে আছি। চারদিক চুপচাপ হয়ে আসছে। নীচে থেকে মা-মাসিমাদের গলার আওয়াজ ছাদ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। মাঝে-মাঝে হাসপাতালের বিশাল বটগাছের কোটর থেকে তক্-কোক্, তক্-কোক করে তক্ষক ডেকে উঠছে। একটা কালো পেঁচা হঠাৎ আমাদের মাথার উপর দিয়ে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উড়ে গেল। মুন্নি ভয় পেয়ে আমার হাত চেপে ধরে। ঝুমা আমার পিঠে মুখ লুকোয়। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি হয়তো কিছু অঘটন ঘটবে। সামপানদা থাকলেও হত। কোথায় গেল সামপানদা ! এখনও কি শিলিগুড়ি থেকে ফেরেনি সামপানদা !

সময় যত এগিয়ে আসছে বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে যেন। চাঁদের আলো পড়ে মর্গের ছোট ঘরটাকে কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। জেলখানার পেটা ঘড়িতে ঠিক সেই সময় ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। হঠাৎ একটা পায়ের শব্দ কানে এল। কে যেন এগিয়ে আসছে মর্গের দিকে। তাকিয়ে দেখি একটা ছায়ামূর্তি। সারা শরীর আলোয়ানে মুড়ে মর্গের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে বুড়্ঢাদা। হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ। হাওয়া লেগে তিরতির করে কাঁপছে প্রদীপের শিখা।

মুন্নি বলল, "দাদা, দ্যাখ বুড়্ঢাদা।"

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।"

ঝুমা বলল, "হাতে রসগোল্লা দেখছি না তো।"

মুন্নি বলল, "আছে নিশ্চয়, অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

চাবি লাগিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলছে বুড়্ঢাদা। দরজা খোলার ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা চামচিকে বেরিয়ে এসে উড়তে লাগল মর্গের সামনে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়্ঢাদার হাতের প্রদীপ নিবে গেল। আমরা প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে ছাদে দাঁড়িয়ে এ-সব দেখে যাচ্ছি। বড় আফসোস হচ্ছিল, এই সময় সামপানদা নেই। অন্ধকারের মধ্যেই মর্গের ছোট্ট ঘরটার ভেতরে ঢুকে যায় বুড়্ঢাদা। মনে মনে বলি, ব্রেভো বুড়্ঢাদা।

কয়েক মিনিট চুপচাপ। হঠাৎ একটা আর্তনাদ মর্গের ভেতর থেকে ভেসে এল যেন। বুড়্ঢাদার গলা না ! বুড়্ঢাদা কি চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে ! আমরা তাড়াতাড়ি নেমে এলাম নীচে একেবারে মর্গের সামনে। ভয়ার্ত চিৎকার শুনে বড়রাও নেমে এসেছে। হাসপাতাল থেকেও কিছু লোক এসে হাজির হয়েছে।

তাকিয়ে দেখি, মর্গের বাইরের চাতালটায় চিত হয়ে শুয়ে আছে বুড়্ঢাদা। বুড়্ঢাদার গায়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তো-তো করে কী যেন বলতে চেষ্টা করছে বুড়্ঢাদা। এ কী, ভিড়ের মাঝে দেখি সামপানদা !

আমাকে দেখতে পেয়ে সামপানদা বলে, "একটু জল নিয়ে আয় কাবুল তাড়াতাড়ি। বুড়্ঢার চোখে-মুখে একটু ছিটিয়ে দিই। বেচারা বড্ড ভয় পেয়েছে।"

এদিকে দেখি, ছিরু ডোমও এসে হাজির। ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে বলল, "কী বেপার ! কী হইয়েছে কী ?"

ছোটমেসো হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "রাত দুপুরে হচ্ছে কী এসব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বুড়্ঢাদা একটু সুস্থ হয়ে উঠে কাঁপা গলায় তো-তো করে বলল, "মর্গে ঢুকে দেখি মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা চাদরে

ঢাকা দু-দুটো লাশ পড়ে আছে অন্ধকারে।"

আমি উদ্বেগ নিয়ে বললাম, "তারপর তারপর ?"

বুড়্ঢাদা বলল, "হাতের প্রদীপটা বাতাস লেগে নিবে গেছে বলে চাঁদের আলো যেটুকু ঘরে ঢোকে তাতেই হাতড়ে হাতড়ে সামনে পড়ে থাকা লাশের মুখের ঢাকা সরিয়ে ওটার হাঁ-করা মুখে রসগোল্লা তুলে দিলাম।"

ছোটমাসি বলল, "তা, হ্যাঁ রে বুড়্ঢা, তুই সত্যি সত্যি ওটার মুখে তুলে দিলি রসগোল্লা ?"

বুড়্ঢাদা বলল, "তবে আর বলছি কী।"

মুন্নি বলল, "তারপর কী হল বুড়্ঢাদা ?"

বুড়্ঢাদা বলল, "রসগোল্লা মুখে দিতেই দেখি লাশটা কচকচ করে পুরো রসগোল্লাটা খেয়ে ফেলল।"

ছোটমাসি বলল, "সে কী রে !" তারপর ছোটমেসোর উদ্দেশে বলল, "ওগো, আমার হার্টের বড়িটা শিগগির নিয়ে আসতে বলো।"

মুন্নি ভয়ে ভয়ে মর্গের অন্ধকার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে ওখানে ভূত আছে বলো।"

আমরা কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। সবাই কেমন চুপচাপ। বুড়্ঢাদা তখনও একটু হাঁপাচ্ছে। এই কড়া শীতেও বুড়্ঢাদার কপালের ঘাম চিকচিক করছে। কেবল ছিরু ডোম কেমন যেন ছটফট করছে। সামপানদাও কেমন অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

ছোটমাসি ছিরু ডোমকে বলল, "বাবা ছিরে, দয়া করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে অলুক্ষুনে ঘরের দরজাটা বন্ধ করো আগে।"

হঠাৎ দেখি নিশ্বাস নেবার মতো বুড়্ঢাদা নাকটা দু'বার টেনে নেয়। কিসের যেন গন্ধ নিতে চেষ্টা করে। তারপর সামপানদার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে, "তুই একবার আমার দিকে সরে আয় তো সামপান।"

সামপানদা একটু ইতস্তত করে কাছে যেতেই বুড়্ঢাদা বলল, "এ কী, তোর গায়ে ফরম্যাল ডি হাইডের গন্ধ কেন ?"

ছোটমাসি বলল, "ফরম্যাল ডি হাইড ! সে আবার কী ?"

বুড়্ঢাদা বলল, "এক ধরনের কেমিক্যাল আরক, যাতে লাশ ভিজিয়ে রাখে।"

ছোটমাসি বলল, "ও মা গো ! কেন ?"

বুড়্ঢাদা বলল, "লাশ যাতে তাড়াতাড়ি পচে না যায়।"

সামপানদা একটু একটু করে বুড়্ঢাদার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায়। সামপানদার আপাদমস্তক ভাল করে যাকে বলে নিরীক্ষণ করে বুড়্ঢাদা খপ্ করে সামপানদার একটা হাত ধরে ফেলে। বুড়্ঢাদার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তারপর সামপানদার শার্টের কলারের কাছ থেকে কী একটা আঙুল দিয়ে তুলে নিয়ে বলে, "তোর শার্টের কলারে চটচটে কী লেগে আছে রে সামপান ?"

আমি বললাম, "ফরম্যাল ডি হাইড বোধহয়।"

বুড়্ঢাদা আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বলল, "না, ফরম্যাল ডি হাইড নয়, রসগোল্লার রস।"

মুন্নি অবাক হয়ে বলল, "রসগোল্লার রস !"

সামপানদা থতমত খেয়ে বলল, "কী জানি, বুঝতে পারছি না তো, রস কী করে এল !"

ঝুমা বলল, "চেটে দ্যাখো না কাবুলদা।"

আমি চট করে সামপানদার রস-লাগা শার্টের কলারে আঙুল ঠেকিয়ে আঙুলটা জিভে দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, মিষ্টি-মিষ্টি লাগছে। এ কী, এ যে রসগোল্লার রস !"

সামপানদা নিমেষেই কী রকম বোকা-বোকা হয়ে যায়। বুড়্ঢাদা কটমট করে সামপানদার দিকে তাকাতেই সামপানদা বলে উঠল, "তোর রসগোল্লাটা খাসা ছিল রে বুড়্ঢা। বোধহয় স্পঞ্জ রসগোল্লা ছিল, তাই না রে ?"

বুড়্ঢাদা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, "মা-র্ভে-লা-স।"

ছোটমেসো এতক্ষণ পরে রাগ-রাগ মুখ করে বললেন, "তা হলে বুড়্ঢা, এটা তোদের রাতদুপুরে সবাইকে জ্বালানোর একটা ফন্দি।"

মুন্নি সামপানদাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা সামপানদা, তুমি মর্গের ভেতরে ঢুকলে কী করে ? মর্গের দরজায় তো তালা লাগানো থাকে।"

সামপানদা বলল, "ছিরু ডোমকে হাত করে মর্গের দরজা খুলিয়ে বুড়্ঢা মর্গে ঢোকার আগেই মর্গের ভেতরে লাশ সেজে শুয়েছিলাম। ছিরু ডোম বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল আমারই কথামতো।"

ঝুমা বলল, "মর্গের ভেতরে অন্ধকারে শুয়ে থেকে তোমার ভয় করছিল না সামপানদা ?"

সামপানদা বলল, "ভয় ! ভয় করলে বুড়্ঢাকে অমন ভয় দেখানো যেত।"

আমি বললাম, "ক্রিকেট টেস্টের কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের কী হবে তবে ?"

সামপানদা বলল, "আমি দেখব দু'দিন আর বুড়্ঢা দু'দিন, কারণ আমরা কেউই হারিনি।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, "বাকি একদিন কিন্তু আমি।"

ছবি : প্রবীর সেন

স্নেহ

নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড় মিল্ক পাউডার

স্নেহ স্কীমড় মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন—চা বা কফি, দই বা মিঠান্ন বানানোর জন্যে।

স্নেহ স্কীমড় মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।

স্নেহ-প্রকৃতির সস্নেহ উপহার!

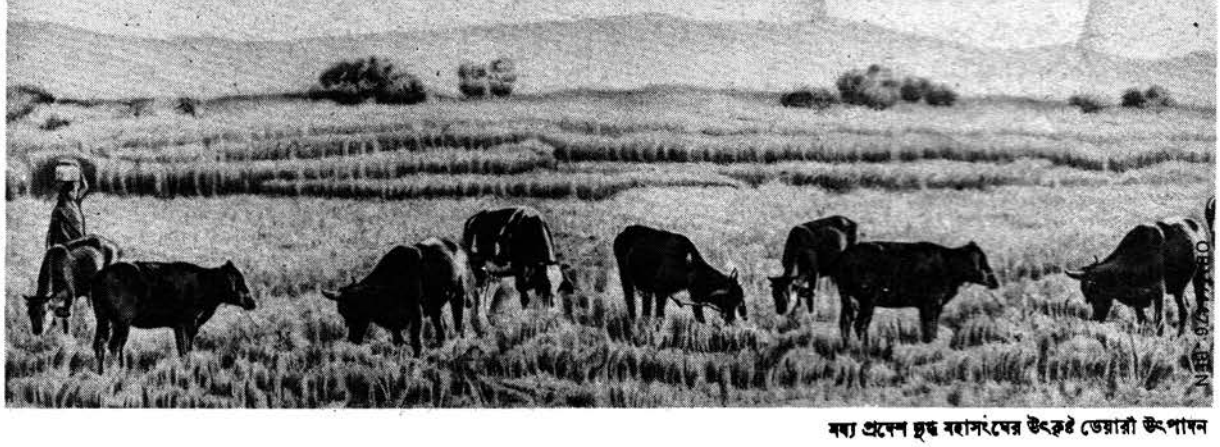

মধ্য প্রদেশ ক্ষুদ্র বহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তার স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। একটা চাবি দিয়ে সে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" লোকটা নাকি উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। উটকো লোকটা, আপাতত যার নাম পঞ্চানন্দ, দুজনকেই ভূতের ভয় দেখায়। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির ক্রীড়া-দক্ষতা দেখে হাতরাশগড়ের মহারাজা কোচ রেখে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে চান। মহারাজার গাড়িতে সন্দিগ্ধ দুই ভাই তাঁকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। গাড়ি থামতে তারা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে বাসে ওঠে। বাসের মধ্যে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। দুই ভাইয়ের ফিরতে দেরি দেখে হরিবাবু উদ্বিগ্ন, এমন সময় তারা বাড়ি ফেরে, কিন্তু কাউকে কিছু জানায় না। তারপর···

গজ পালোয়ান নামটা শুনলে মনে হয় লোকটা বুঝি হাতির মতোই বিরাট আকারের। কিন্তু আসলে গজ পালোয়ানের চেহারা মোটেই সেরকম নয়, জামাকাপড় পরা অবস্থায় তাকে পালোয়ান বলে মনেই হয় না। ছিপছিপে গড়ন, লম্বাটে চেহারা, মুখচোখ নিরীহ, একটু সাধু-সাধু উদাস-উদাস ভাব। ল্যাঙট পরে খালি গায়ে যখন সে কুস্তি শেখাতে দঙ্গলে নামে, তখন তার বিদ্যুতের মতো গতি আর বাঘের মতো শক্তির খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। ঘুসি মেরে যে পাথর ভাঙতে পারে, দু' প্যাকেট তাস একসঙ্গে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, তিন আঙুলের চাপে বেঁকিয়ে দিতে পারে একটা কাঁচা টাকা।

গজ খুব সাদাসিধে মানুষ। চকসাহেবের ভাঙা পোড়োবাড়ির একখানা ঘর নিয়ে সে থাকে। আসবাব বলতে একটা দড়ির খাটিয়া, একখানা উনুন আর কয়েকটা বাসনপত্র। জামাকাপড় তার বিশেষ নেই। যা আছে তা একটা দড়িতে ঝোলে। থাকার মধ্যে আর আছে একখানা পাকা বাঁশের তেল-চুকচুকে পাঁচ-হাত লাঠি। পুরনো বাড়ি বলে মাঝে-মাঝে বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে আসে। গজ সাপখোপ মারে না, লাঠি মেঝেয় ঠুকে শব্দ করে তাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া লাঠিটা আর কোনও কাজে লাগে বলে কেউ জানে না। তবে মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র যেটা, তা লাঠি-বন্দুক এসব নয়। সেটা হল দুর্জয় সাহস। গজ পালোয়ানের সেইটে আছে।

চকসাহেবের বাড়ি নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। চক নামে কোনও নীলকর বা অন্য কোনও সাহেব এই বাহারি বাড়িখানা বানিয়েছিল। তারা মরে-হেজে যাওয়ার পর এ-বাড়ি ছিল ডাকাতের আস্তানা। তারপর ভূতের বাড়ি হিসেবেও রটনা হয়েছিল একসময়। আস্তে-আস্তে বাড়িটা ভেঙে পড়ছে, জঙ্গলে ঢেকে যাচ্ছে। বসবাসের যোগ্য আর নেই। এই পড়ো-পড়ো বাড়িতে থাকতে যে-কারও ভয় পাওয়ার কথা। তার ওপর ভূতপ্রেত এবং সাপখোপ। গজ এই ভগ্নপ্রায় বাড়িটার জঙ্গল কেটে কুস্তির আখড়া বানিয়েছে, একটা ঘর কোনওরকমে বাসোপযোগী করে নিয়েছে। বিকেলে গুটি দশবারো ছেলে তার কাছে কুস্তি শিখতে আসে। বাকি দিনরাত সে একা থাকে। কেউ তাকে বড় একটা ঘাঁটায় না। সে কোথাকার লোক, কেন তাকে জখম অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তার কে আছে, এসব খবর কেউ জানে না।

আজ রাত্রে প্রচণ্ড শীত পড়েছে। গজ খিচুড়ি রাঁধবে বলে চালে-ডালে মিশিয়ে উনুনে চাপিয়ে খাটিয়ায় বসে একটা বই পড়ছিল। চারদিকটা খুব নিঝুম। তবে পুরনো বাড়িতে নানারকম শব্দ থাকেই। যেমন, একটা তক্ষক বা প্যাঁচা ডেকে উঠল, একটা নড়বড়ে কপাট ফটাস করে বাতাসে বন্ধ হয়ে গেল, একটা বেড়াল ডেকে উঠল, মিয়াও। তা ছাড়া ঝিঁঝির শব্দ আছে, মশার পনপন আছে, ইঁদুরের 'চিকচিক' আছে। এ-সব সত্ত্বেও চকসাহেবের বাড়ি খুবই নিস্তব্ধ।

গজর গরম জামা বলতে প্রায় কিছুই নেই। একটা মোটা খদ্দরের চাদর আর একখানা কুটকুটে কালো কম্বল। কম্বলখানা সে শোওয়ার সময়ে গায়ে দেয়। এখন শুধু চাদরখানা জড়িয়ে বসে ছিল সে। বই পড়তে-পড়তে হঠাৎ সে উৎকর্ণ হয়ে মুখ তুলল। তার মনে হল, সে একটা অচেনা শব্দ শুনেছে। কীরকম শব্দ তা বলা মুশকিল। তবে পুরনো বাড়িতে যে-সব শব্দ হয়, সবই তার চেনা। এ-শব্দ সে-রকম নয়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল গজ। আজ কৃষ্ণপক্ষের নিকষ অন্ধকার রাত্রি। তার ওপর গাঢ় কুয়াশা পড়েছে। এইরকম রাত্রে চকসাহেবের বাড়িতে খুব সাধারণ কেউ আসবে না। কিন্তু গজর মনে হল, সে কারও একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে।

টেমিটা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে গজ উঠল। অভ্যস্ত জায়গা থেকে লাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে ছায়ার মতো নিঃশব্দে সে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘরের সামনেই একটা বারান্দা। ছাদটা অনেকদিন আগেই ভেঙে পড়ে গেছে, আছে শুধু একটু বাঁধানো চাতাল আর তিনটে থাম।

গজ একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই একটা কিছু অনুভব করার চেষ্টা করল। চারদিক নিস্তব্ধ।

তবে কি গজ ভুল শুনেছে ? না, সেটা সম্ভব নয়। গজকে যে অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়, তা সাধারণ গেরস্থ মানুষের জীবনের মতো নয়। তার কান সজাগ, চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অনুভূতি প্রবল। সুতরাং তার ভুল সহজে হয় না।

যারা চোখে দেখে না, তাদের শ্রবণশক্তি এবং অনুভূতি ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এটা লক্ষ করে গজ একসময়ে দিনের পর দিন চোখে ফেট্টি বেঁধে রেখে নিজের অনুভূতি ও শ্রবণশক্তি বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করেছে। যারা কানে শোনে না, তাদের দৃষ্টি থাকে সবদিকে। সুতরাং গজ কিছুদিন কানে তুলো গুঁজে রেখে শব্দ না শুনেও শব্দকে অনুভব করার চেষ্টা করেছে এবং ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তিকে করে তুলেছে চৌখস। গজ জানে, একটু ভুল হলেই তার প্রাণসংশয়। রাতে সে যখন

ঘুমোয়, তখনও তার কান এবং অনুভূতি জেগে থাকে। সামান্য একটু অস্বাভাবিক শব্দ হলেই সে তড়াক করে উঠে পড়ে। সাধারণ যে-কোনও মানুষের চেয়ে তার ঘ্রাণ, শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি বহুগুণ বেশি। সুতরাং আজও তার ভুল হয়নি।

বাগানে খোয়া-বিছানো রাস্তায় একটা নুড়ি-পাথরের গড়িয়ে যাওয়ার একটু শব্দ হল না?

গজ বারান্দা থেকে নেমে বোগেনভেলিয়ার ঝোপটার আড়ালে সরে গেল। তার শরীরের পেশিগুলো শক্ত হয়ে গেল, ঘ্রাণ-শ্রবণ-দৃষ্টিশক্তি হয়ে উঠল ক্ষুরধার। কে আসছে? কী চায়?

ঝোপের আড়ালে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গজ। কিন্তু আর কোনও শব্দ নেই, কোনও নড়াচড়া নেই, কোনও গন্ধ নেই। কিন্তু তবু গজর মনে হতে লাগল, সে এ-বাড়িতে আর একা নয়। কোনও একজন আগন্তুক এ-বাড়ির কোথাও নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে।

খিচুড়ির পোড়া গন্ধ পেল গজ। কিন্তু তবু অনেকক্ষণ নড়ল না। সে বুঝল, যে-ই এসে থাক, সে খুব তুখোড় লোক। গজর চোখ-কান-নাককে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ কাজ নয়।

অন্ধকারে আর একবার চারদিকে চোখ চালিয়ে গজ ধীরে-ধীরে বারান্দায় উঠল এবং ঘরে ঢুকে টেমি জ্বালাল।

খিচুড়িটা একদম পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। হাঁড়িটা নামিয়ে রাখল সে। তারপর টেমিটা তুলে নিয়ে এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে দেখল। কোথাও কেউ নেই।

গজ খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। জীবনে বহুরকম বিপদে পড়েছে এবং বেঁচেও গেছে। সুতরাং বিপদকে তার ভয় নেই। তার অস্বস্তিটা অন্য কারণে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, তার চোখ-কান-নাককে ফাঁকি দিয়ে যদি কেউ এ-বাড়িতে ঢুকেই থাকে, তবে সে সাধারণ মানুষ নয়। হয়তো সে মানুষই নয়।

তবে কি অশরীরী?

গজ খুব চিন্তিতভাবে বইখানা আবার খুলে বসল। কিন্তু মন দিতে পারল না।

একটা হুলো বেড়াল ভীষণ ডাকছে কোথায় যেন। কিছু দেখতে পেয়েছে কি? খুব ভয় পেয়েছে যেন!

হঠাৎ দুটো চামচিকে অন্ধের মতো চক্কর মারতে লাগল ঘরের মধ্যে। একটা ভাঙা দরজায় শব্দ হল, ক্যাঁচ।

গজ স্থির হয়ে বসে রইল। মাঠে ময়দানে, শ্মশানে কবরখানায় সে বহু রাত কাটিয়েছে। কখনও ভয় পায়নি। কিন্তু আজ এই প্রচণ্ড শীতেও তার কপালটা একটু-একটু করে ঘেমে উঠছে। লাঠিটা মুঠোয় নিয়ে সে বসে রইল চুপ করে। কী করবে তা ঠিক করতে পারছিল না। বিদ্যুতের মতো যার গতি, বাঘের মতো যার শক্তি, দুর্জয় যার সাহস, সেই গজ পালোয়ান কি আজ ভয় পাচ্ছে?

হঠাৎ একা ঘরেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল গজ। সেই হাসির দমকে তার ভয় ভীতি উড়ে গেল। হঠাৎ শরীরে এল মত্ত হাতির ক্ষমতা। গজ পালোয়ান তার লাঠিটা নিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে বিকট একটা হুঙ্কার ছেড়ে বলল, "কে রে, চোরের মতো ঢুকেছিস বাড়িতে? বাপের ব্যাটা হয়ে থাকিস তো সামনে আয়!"

কেউ এই হুঙ্কারের জবাব দিল না। চারদিক নিস্তব্ধ।

গজ পালোয়ান আবার হুঙ্কার দিল, "শুনতে পেয়েছিস? সামনে আসার মতো বুকের পাটা নেই তোর?"

গজ পালোয়ান কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল।

হঠাৎ বারান্দায় খুব মৃদু একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। খুব ধীর পদক্ষেপে কে যেন আসছে।

গজ শক্ত হাতে লাঠিটা ধরে অপলক চোখে দরজার দিকে চেয়ে রইল।

প্রথমে একটা ছায়া বারান্দার গাঢ় অন্ধকারে একবার যেন নড়ে উঠল। তারপর হঠাৎ দরজায় এসে দাঁড়াল দীর্ঘ রোগা একটা লোক। এত লম্বা আর শুঁটকো চেহারার লোক গজ কখনও দেখেনি। পরনে গাঢ় রঙের একটা স্যুট। বুক থেকে সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরে পড়ছে।

সাদা ফ্যাকাসে মুখে লোকটা গজর দিকে একটু চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ওই লম্বা শরীরটা কাটা গাছের মতো পড়ে যেতে লাগল মেঝেয়।

গজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইল। এক পা নড়ার ক্ষমতাও তার ছিল না।

লোকটা মেঝের ওপর দড়াম করে পড়ে একটু ছটফট করল। তারপর নিথর হয়ে গেল।

সম্বিত ফিরে পেতে অনেকক্ষণ সময় লাগল গজর। ঘটনাটা কী ঘটল তা সে বুঝতে পারছে না। কে খুন করল লোকটাকে? কেন?

গজ পালোয়ানের অবশ হাত থেকে টেমিটা পড়ে নিবে গেল। লাঠিটাও খসে গেল মুঠো থেকে।

গজ এবার সত্যিকারের ভয় পেল। এ-ভয়ের কারণ অন্য। এ-ভয়ের সূত্র লুকিয়ে আছে তার অতীত জীবনে। সে বুঝল, যে-লোকটা তার দরজায় মরে পড়ে আছে, তার লাশ রাতারাতি পাচার করার উপায় নেই। পুলিশ আসবে, তাকে জেরা করবে। অনেক জল ঘোলা হবে তাতে।

গজ অন্ধকারে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। না, তাকে পালাতে হবে। সঙ্গে বিশেষ কিছু নেওয়ার নেই।

দড়ি থেকে জামাকাপড়গুলো টেনে আর বিছানা থেকে কম্বলখানা তুলে সে বিছানার চাদর দিয়ে একটা পুঁটুলি বানাল দ্রুত হাতে। বাসনকোসনগুলো পড়ে রইল। থাকগে। গজকে এখনই পালাতে হবে। সময় নেই।

পোঁটলা ঘাড়ে নিয়ে গজ পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগল ফটকের দিকে।

(ক্রমশ)

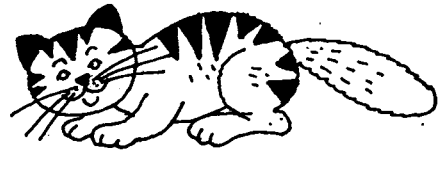

ভারত চেনার উৎসবে

চঞ্চল পাল

প্রাচীনতম রসায়নাগারে ভারত একদা যেভাবে আতর তৈরি করত

বুক ফুলিয়ে বলার মতো ভারতের যা কিছু ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য, তা নিয়ে শুরু হয়েছে মার্কিন মুলুকে ভারত-উৎসব। গত ৬ জুন থেকে শিকাগো শহরে ভারত সাজিয়েছে তার কিছু পসরা। তারপর লস এঞ্জেলেস, পোর্টল্যাণ্ড, সিয়াটল, শার্লেটি ও বোস্টনে দু-তিন মাস করে কাটিয়ে সম্ভবত রওনা হবে প্যারিসের দিকে। আরও বহু দেশ থেকে আমন্ত্রণ আসছে ভারত-উৎসবের। কিন্তু, কেন ভারতের প্রতি এত আগ্রহ ? কী আছে তার দেবার মতো, যার জন্যে সে সারা দুনিয়ার কাছে এত মনোযোগ আদায় করতে পারে ?

নিন্দুকেরা ভারত সম্বন্ধে যতই অপবাদ দিয়ে বেড়াক না কেন, সারা বিশ্ব জানে যে, একদা কী বিপুল ঐশ্বর্য ছিল ভারতের বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে ! ভারত অবশ্য আজ একটু পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। ভারত আবার অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে জোর কদমে।

ভারত-উৎসবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দীর্ঘ ইতিহাসের একটা বিরাট প্রদর্শনী সাজাবার ভার নিয়েছে কলকাতার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়াম। কিন্তু প্রদর্শনী মানে কিছু নীরস ছবি সারি দিয়ে টাঙানো নয়, সে এক এলাহি ব্যাপার। এর মূল পরিকল্পনা যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে সেই ডঃ সরোজ ঘোষের কাছে গিয়ে যা দেখলাম আর শুনলাম তাতে তাক্ লেগে যাবার যোগাড়। সেই বিস্ময়ের ভাগ তোমাদের দেবার চেষ্টা করছি।

প্রদর্শনীতে ঘুরতে ঘুরতে মনে হবে যেন ফিরে গেছি সেই খ্রিষ্টপূর্ব ভারতবর্ষে। কোথাও ছায়াসুনিবিড় তপোবন—গুরুর পদপ্রান্তে বসে শিষ্যের দল কণ্ঠস্থ করছে সামবেদের অঙ্কের কৌশল ; কোথাও ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা—সুপ্রাচীন যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিশুদ্ধ করে তোলা হচ্ছে লোহা, তামা বা দস্তা ; প্রাচীনতম কোনও রসায়নাগারে তৈরি হচ্ছে ওষুধ, গন্ধদ্রব্য বা সাজগোজের উপকরণ ; কোথাও প্রাচীন শিল্পীদের সমাবেশ—পাথর, কাঠ, মোম, লোহা, তামা বা রুপোকে কুরে কুরে তাঁরা গড়ে তুলছেন অপরূপ মূর্তি।

প্রথমেই দর্শকরা পাবে প্রাচীনতম সভ্যতার শিহরন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কিছু মৃৎপাত্র আর চাষের জিনিসপত্র যাচ্ছে রাজস্থানের কালিবাংগান্ নামক জায়গা থেকে। এতদিন ধারণা ছিল, সিন্ধুসভ্যতাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। বয়স ধরা হয় খুব জোর সাড়ে চার হাজার বছর। কিন্তু ১৯৫৬ সালে আবিষ্কৃত কালিবাংগানের জিনিসপত্র আরও অনেক প্রাচীন বলে আজ জানা গেছে। একটা বিশ্বরেকর্ড ভেঙে আর একটা বিশ্বরেকর্ড তৈরি করার নজির আর কি !

কালিবাংগান ও সিন্ধুসভ্যতায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রমাণ মেলেনি বটে, তবে চাষবাস করা আর ঘর-সংসারের জিনিসপত্র তৈরি করার জন্যে যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের দরকার তা তারা বুঝে নিয়েছিল। অথচ ইউরোপের একটা বড় অংশের মানুষ তখনও বনে-জঙ্গলে উলঙ্গ হয়ে কাঁচা মাংস খাচ্ছে আর গুহাবাস করছে।

তারপর এল ঋক্‌বেদ, মোটামুটি ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। মানুষের প্রথম বিজ্ঞানচেতনার পথিকৃৎ ভারতের এই ঋক্‌বেদ। কী সুন্দর শ্লোকের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যার নানা

Amela—6 (26.6.85)

পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে ঋক্‌বেদের কয়েক জায়গায়, তা মডেল দিয়ে বোঝানো হবে ভারত-উৎসবে। অতকাল আগে ঋক্‌বেদের ২৭টি নক্ষত্রের আবিষ্কার আজও সাহেব পণ্ডিতদের কাছে বিস্ময়কর। গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, নিউটন, কেপলার গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে যেসব সূত্র আবিষ্কার করেছেন সেগুলোর আভাস দেওয়া আছে ঋক্‌বেদে, সূর্যসিদ্ধান্তে (১ম ও ২য় শতাব্দী) ও বরাহমিহিরের নবসূর্যসিদ্ধান্তে (ষষ্ঠ শতাব্দী)। কীভাবে ১২টি রাশি ও ২৭টি নক্ষত্রে সূর্য ও গ্রহগুলোর অবস্থান খালি চোখে তাঁরা গণনা করতেন—তা হাতে কলমে দেখানো হবে প্রদর্শনীতে, একটা জটিল ধাতব গোলকের সাহায্যে।

ঋক্‌বেদের শ'তিনেক বছর পরে এসেছে সামবেদ। গণিতচর্চার অজস্র নিদর্শন লুকিয়ে আছে সামবেদের শ্লোকে। শূন্য আবিষ্কার হতে তখনও প্রায় হাজারদেড়েক বছর বাকি। অথচ 'শূন্য' নামক সঙ্কেতটার ধারণা তখনই খেলতে শুরু করেছে সামবেদ-প্রণেতাদের মাথায়। তার চেয়েও ভাবতে অবাক লাগে যে, আধুনিক দশমিক পদ্ধতির একটা ক্ষীণ ধারণা তখনই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। দশ দিয়ে গুণ করতে করতে একটা সংখ্যাকে কীভাবে বড় করা যায় তা লেখা আছে সামবেদে। এই দশ দিয়ে গুণভাগ করাই আধুনিক দশমিক পদ্ধতির মূল কথা নয় কি ?

শূন্য আবিষ্কারের মতো বৈপ্লবিক ঘটনা বিজ্ঞানের জগতে আর কখনও ঘটেনি এবং এই আবিষ্কারের একমাত্র দাবিদার ভারতবর্ষই—একথা আজ সবাই জানে। কিন্তু একদিনে তো শূন্য গজিয়ে ওঠেনি ; বহু শতাব্দী ধরে ভারতের গণিতজ্ঞরা শূন্য নিয়ে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। অনেকেই জানেন না, আজকের মতো একটা ছোট্ট বৃত্ত দিয়ে শূন্য লেখা সেদিন চালু হয়নি। শূন্য বলতে প্রথমে এসেছিল একটু ফাঁকা জায়গা ; যেমন ৪৫০৭ কে লেখা হত ৪৫ ৭। তারপর ফাঁকা জায়গাটা ভরাট হতে লাগল একটা ছোট্ট ফুটকি দিয়ে ; যেমন, ৩২০১ কে লেখা হত ৩২·১। ফলে শূন্য দিয়ে অঙ্ক কষতে আজকের চেয়ে একটু আলাদা পদ্ধতির শরণ নিতে হত। এই পদ্ধতিতে অঙ্ক কষার প্রাচীনতম পুঁথি পাওয়া গেছে পেশাওয়ারের বাখশালিতে। কিন্তু ভারত-উৎসব শুধু পুঁথি দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকবে না ; কীভাবে তারা শূন্য দিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ করত তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবেন গাইডরা এবং দর্শকরাও যাতে হাতেনাতে কষে দেখতে পারেন তার জন্যেও থাকবে ব্যবস্থা। ব্যাপারটা মজার নয় কি ?

শূন্য নিয়ে ভারতের গর্ব এখানেই শেষ নয়। শূন্য দিয়ে কোনও সংখ্যাকে ভাগ করলে যে অসীম সংখ্যার উৎপত্তি হয় সেই জটিল ধারণা ইউরোপের মগজে ঢুকেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অথচ ভারতের গণিতজ্ঞ দ্বিতীয় ভাস্কর ছশো বছর আগেই এর সমাধান করে বসেছিলেন।

অঙ্ক নিয়ে আর একটা মজার কথা বলি শোনো। ত্রৈরাশিক নিয়ম যখন আরব বণিকদের হাত ঘুরে ইউরোপে গিয়ে পড়ল তখন খ্রিষ্টের জন্মের দেড় হাজার বছর পার হয়ে গেছে। এটা পেয়ে তাঁরা এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, এর নামের পাশে তাঁরা যোগ করলেন 'গোল্ডেন' শব্দটি, অর্থাৎ স্বর্ণতুল্য (গোল্ডেন রুল অব থ্রি)। অথচ ভারতের পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর পুঁথিতে এই নিয়মের সাহায্য নিয়ে ভূরিভূরি অঙ্ক কষা হয়ে গেছে।

তাছাড়া, বর্গমূল ও ঘনমূল করার উপায় ইউরোপ শিখেছে ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ, অথচ আর্যভট্ট তাকে আবিষ্কার করে গেছেন খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই। এসবের সঙ্গে ভারত-উৎসবে দেখানো হচ্ছে কীভাবে আর্যভট্ট একটা বিরাট বৃত্তকে ৩৮৪ ভাগে ভাগ করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বার করেছিলেন, অথচ বৃত্তের ক্ষেত্রফলের আধুনিক সূত্র বেরিয়েছে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে।

দেখতে দেখতে ঢুকে পড়তে হবে প্রাচীন ভারতীয় রসায়নাগারে। ইতিহাস ঘেঁটে যেরকম জানা গেছে, ঠিক সেইরকম ঘরের চেহারা, পাত্র, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি। একটা ঘরে তৈরি হচ্ছে ফুলের নির্যাস বা আতর। মূল পদ্ধতিটা আসলে পাতন প্রক্রিয়া ; অর্থাৎ ফুল ভেজানো জলকে বাষ্পীভূত করে বাষ্পকে আবার ঠাণ্ডা করা। তফাত শুধু যন্ত্রপাতির—গ্যাস বার্নারের বদলে উনুন, ফ্লাস্কের বদলে মুখ-ঢাকা পাথরের পাত্র আর কন্‌ডেন্‌সারের বদলে মাটির জালায় ভিজে কাপড়ের প্রলেপ।

পাশাপাশি চলছে ভেষজ তৈরি, অষ্টম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের অথর্ববেদ ও প্রথম শতাব্দীর ধন্বন্তরি চরক ঋষির নির্দেশিত পদ্ধতিতে। কোন্ গাছের পাতায় কী রাসায়নিক দ্রব্য আছে আর তার ভেষজগুণ আছে কি না তা আয়ুর্বেদ কী করে জেনেছে তা ভাবতে গেলে দিশেহারা হতে হয়। চরকের পাশাপাশি নাম করতে হয় সুশ্রুতের, যিনি শল্যচিকিৎসার জনক। অতকাল আগে অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি কতটা বৈজ্ঞানিক হতে পারে তা জানতে তাঁর উদ্ভাবিত কিছু ছুরি-কাঁচি দেখলেই যথেষ্ট। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোনও বড় হাসপাতালের অপারেশন টেবিল থেকে তুলে আনা হয়েছে, এত নিখুঁত ! এছাড়া যিশুখ্রিষ্টের সমসাময়িক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে শব-ব্যবচ্ছেদের কথা আর মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের পদ্ধতি।

রসায়নের আর একটা দিকেও প্রাচীন ভারতের ধারেকাছে কেউ পৌঁছতে পারেননি। সেটা হচ্ছে ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি। তাম্রযুগের পর লৌহযুগের সূত্রপাত হয় ভারতেই। কারণ তামা গলানো অনেক সহজ, কিন্তু লোহাকে গলাতে গেলে চাই ১২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপ। এই উত্তাপ তৈরি করার প্রযুক্তিবিদ্যা প্রথম জেনেছিল ভারত। আধুনিককালে সেই পদ্ধতির অনেক বদল হয়েছে বটে, কিন্তু আজও কয়েকটা উপজাতি বংশপরম্পরায় ধ'রে রেখেছে সেই পদ্ধতি, যেমন ওড়িশার কোরাপুটে। সেই পদ্ধতিকে হুবহু তুলে ধরা হবে ভারত-উৎসবে। সঙ্গে থাকছে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর একটা লোহা গলানোর উনুন, যা আবিষ্কৃত হয়েছে হায়দরাবাদের করিমনগরে। মাত্র কয়েক বছর আগে পৃথিবীর প্রাচীনতম লোহার দণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে এই ভারতেই, উত্তরপ্রদেশের আত্রান্‌জিখেরাতে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর এই নিদর্শনগুলো হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবেন প্রদর্শনীর দর্শকরা।

দিল্লির কুতুবমিনারের পাদদেশে যে ২৪ ফুট উঁচু লোহার স্তম্ভটা ঝড়-জল মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে তার বয়স অন্তত হাজার বছর। কিন্তু আজও তাতে এক ফোঁটা মরচে পড়েনি। লোহার সঙ্গে কার্বন আর ম্যাঙ্গানিজ এত নিখুঁত অনুপাতে মেশানো দরকার যে, একটুখানি হেরফের হয়ে গেলেই আর

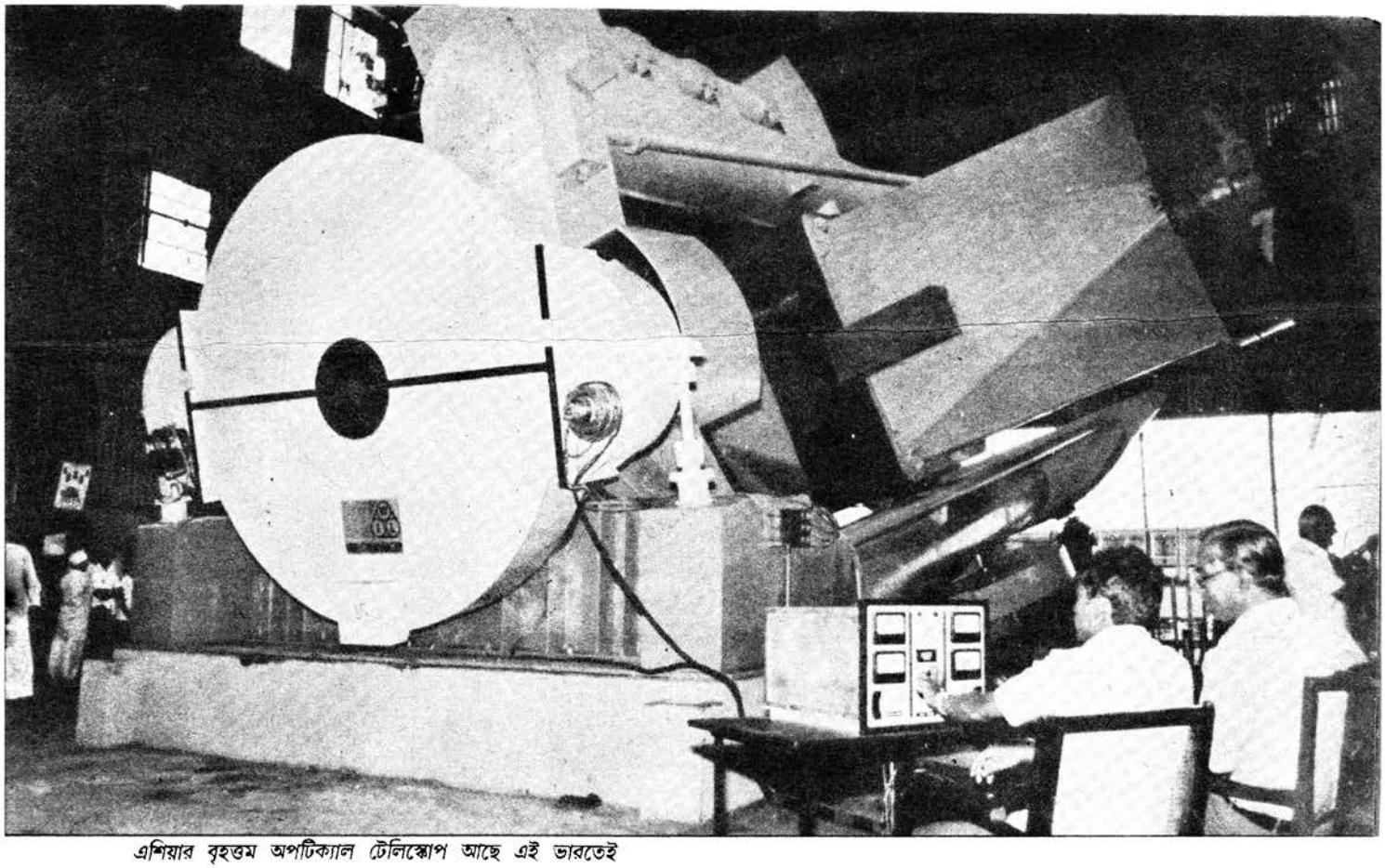

এশিয়ার বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপ আছে এই ভারতেই

মরচেবিহীন স্টিল তৈরি হবে না। এই সূক্ষ্মতা এসেছে বিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু হাজার বছর আগে ভারত তা জানল কী করে ? যাই হোক, স্তম্ভটাকে তো উপড়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তাই এর একটা মডেল যাবে দর্শকদের সঙ্গে সেটির পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে।

ধাতুবিজ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে ইউরোপের একটা কেলেঙ্কারিও বেরিয়ে পড়েছে, যা এতদিন অনেক বিশেষজ্ঞই জানতেন না। প্রাচীনতম দস্তার খনি (৫০০ খ্রিঃ) ও দস্তা-নিষ্কাশন যন্ত্র (১৫০০ খ্রিঃ) পাওয়া গেছে রাজস্থানের জাওয়ার-এ। দস্তা নিষ্কাশন করতে গেলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত করতে হয় যে, তার জন্যে প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ জ্ঞান না থাকলে চলে না। কারণ, তাপমাত্রা সামান্য একটু বেশি হলে দস্তা বাষ্পীভূত হয়ে যাবে আর কম হলে দানা বেঁধে যাবে, ফলে তরল অবস্থায় তাকে বিশুদ্ধ করা যাবে না। বহুকাল ধরে ইউরোপে এটা করার চেষ্টা চলছিল, হঠাৎ ১৭৪০ সালে এক সাহেব একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন, যা নিয়ে সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল আর ইউরোপ শিখল দস্তা তৈরি করতে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সাহেবের যন্ত্রের ছবি আর জাওয়ারের নিষ্কাশন যন্ত্রের ছবি হুবহু এক। তবে কি আবিষ্কারটা চুরি করা ? উত্তর দেবে প্রদর্শনীর দর্শকরাই।

প্রদর্শনীর আর একটা ব্যাপার মন কেড়ে নেবেই। আমরা শিল্পকলা অনেক দেখেছি, কিন্তু কাঠ, পাথর, শোলা, মোম, রুপো বা তামার টুকরো কুরে কুরে শিল্পীরা কীভাবে শিল্পবস্তু তৈরি করেন—তা কজনই বা দেখেছি। বেশ কিছু বিখ্যাত শিল্পীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাঁরা দর্শকদের সামনে শিল্পসৃষ্টির প্রতিটি ধাপ হাতেনাতে করে দেখাবেন। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যা মিশিয়ে বহু যুগ আগেই ভারত যে অসাধারণ শিল্পকলা পৃথিবীকে শিখিয়েছে, সেইগুলিই দেখানো হবে হাতে-কলমে।

এ-রকম হাঁ হয়ে দেখার মতো আরও কত কী যে প্রদর্শনীতে আছে তা বলতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে। শুধু প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য নিয়েই ধুয়ে জল খাওয়া নয়, আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানই বা কম কিসে ? মহাকাশে নিজস্ব রকেট, নিজস্ব মহাকাশচারী ও নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ আর সর্বোপরি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপ্ আর কটা দেশেরই বা আছে ? তাছাড়া ভারতের নিজস্ব কারখানায় তৈরি যানবাহন, ট্র্যাক্টর ও মাটি কাটার যন্ত্র, নিজস্ব পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর, তাপ-বিদ্যুৎ শক্তি ও সৌরশক্তি উৎপাদনের নিজস্ব যন্ত্র, বম্বের উপকূলে পাওয়া খনিজ তেলের নিষ্কাশন, কৃষিবিপ্লবের হাতিয়ার সঙ্কর বীজ, সার, জলসেচ পদ্ধতি ক্রমশ ভারতকে করে তুলছে স্বয়ম্ভর আর সারা বিশ্বের কাছে সম্মানীয়। এইসব প্রকল্প ছবি আর মডেলের সাহায্যে তুলে ধরা হবে দর্শকদের সামনে। বারাণসী ও কাঞ্চিপুরমের রেশম ও ব্রোকেড শাড়ি আর এমব্রয়ডারির বিস্ময়কর কলাকৌশল দেখেও তাজ্জব বনে যাবে বিদেশীরা।

সবশেষে, একটা কথা জেনে তোমাদের আফসোস হবেই তা হচ্ছে, আগামী দু-বছরের আগে এই প্রদর্শনী ফিরে আসছে না ভারতের মাটিতে। তবে ডঃ ঘোষ জানালেন যে আমেরিকায় উৎসবটা শেষ হবার পরেই যাতে ভারতে এগুলো দেখানো যায় তার চেষ্টা চলছে। ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর উপায় কী বলো ?

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

কাভুরুদের হাত থেকে লা-গলিয়েন ও বুইরাকে উদ্ধার করতে এসেছেন টারজান। কিন্তু অগণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি একা !

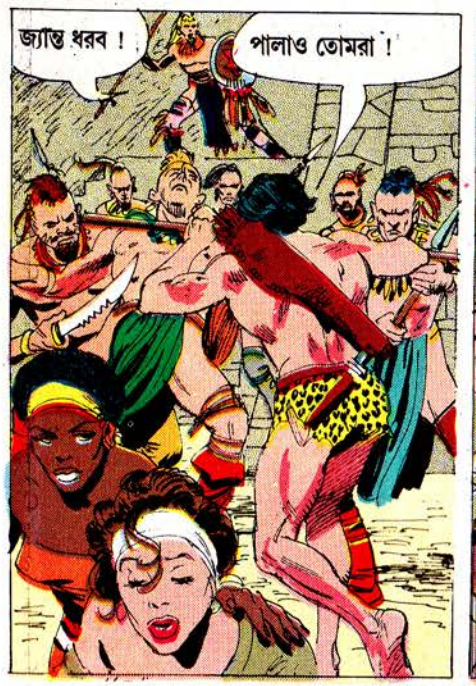

লা-গলিয়েন ও বুইরা পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু টারজান কি রক্ষা পাবেন ?

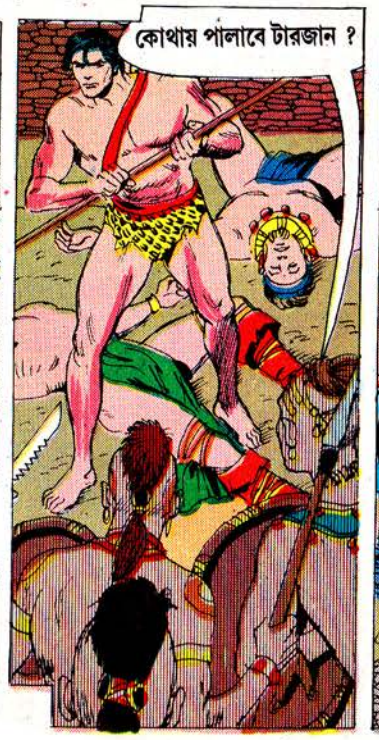

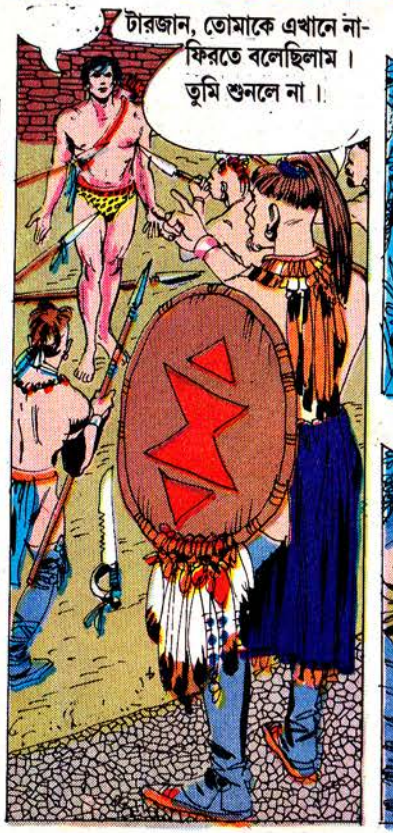

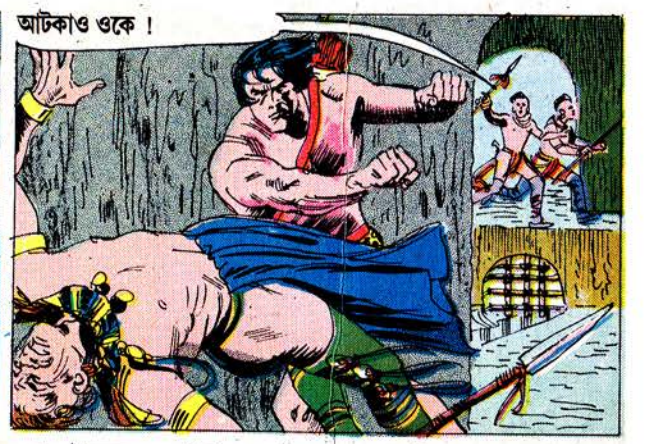

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(সম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথমাংশ)

জুবিলি সার্কাসের আজব খেলা

অজেয় রায়

সকাল প্রায় নটা। গেট খুলে দ্রুত পায়ে এগোতে এগোতে সুনন্দ আমায় ডেকে বলল, "অসিত, সার্কাস দেখতে যাবি ?"

বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে বই পড়ছিলেন মামাবাবু। সুনন্দর কথা শুনে বইখানা থেকে চোখ তুলে সুনন্দকে বললেন, "কোথায় সার্কাস ?"

"বোলপুরে," উত্তর দিল সুনন্দ।

মামাবাবু বললেন, "কী নাম ?"

"জুবিলি সার্কাস। তেমন নামকরা কিছু নয়। ছোট সার্কাস। তবে কয়েকটা নাকি দারুণ খেলা আছে।"

"তুমি জানলে কী করে ?" মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সুনন্দ বলল, "বোলপুরে টর্চটা সারাতে গিয়েছিলাম। সেখানে দোকানে বসে কয়েকজন লোক গল্প করছিল সার্কাসের।"

সুনন্দর গলা পেয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বললাম, "চলুন না মামাবাবু সার্কাসটা আজ দেখেই আসি।"

মামাবাবু বললেন, "তা মন্দ নয়। অনেকদিন দেখিনি সার্কাস। খুব একটা বাজে যদি না হয়।"

সুনন্দ একটু থতমত খেয়ে বলল, "আপনি যাবেন ? বেশ আমি গিয়ে টিকিট কেটে রাখব। পাঁচটার শো-ই ভাল। মনে হয় খেলাগুলো ইন্টারেস্টিং হবে।"

এখন মামাবাবু সুনন্দ এবং আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। মামাবাবু হচ্ছেন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ। সম্পর্কে আমার বন্ধু সুনন্দর মামা। অবিবাহিত। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। আমার নাম অসিত রায়। সুনন্দ বোস আমার ছেলেবেলার বন্ধু। মামাবাবুর কাছেই সে মানুষ। আমি ও সুনন্দ সবেমাত্র পোস্ট-গ্রাজুয়েটের চৌকাঠ ডিঙিয়েছি। এখন রিসার্চ করছি। সুনন্দর বিষয় প্রাণিতত্ত্ব, আমার ইতিহাস।

দুর্গাপূজার পর আমরা তিনজনে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য। মামাবাবুর পরিচিত একজনের একটা বাড়ি ছিল শান্তিনিকেতনে। সেখানে উঠেছিলাম। রান্নার ভার বাড়ির মালি চণ্ডীর হাতে। চালিয়ে দিচ্ছিল মোটামুটি। শুধু

শান্তিনিকেতনে নয়, কাছের খোয়াইয়ে, কোপাই নদীর ধারে, আশেপাশের গ্রামে খুব বেড়াচ্ছিলাম। বেড়ানোর উৎসাহটা আমার চাইতে সুনন্দরই বেশি। মামাবাবু বেশিরভাগ সময় বই পড়ে বা লেখালেখি করে কাটাচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে মাইল-দুই দূরে ছোট্ট শহর বোলপুর। ওখানেই রেলস্টেশন ও দোকানপাট।

সার্কাসটার তাঁবু পড়েছিল বোলপুর রেল-ময়দানে।

বিকেল পাঁচটায় দ্বিতীয় শো শুরু হবার দশ মিনিট আগে মামাবাবু ও আমি সাইকেল-রিক্শা চেপে সার্কাসের সামনে হাজির হলাম। সুনন্দ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম চিবুচ্ছিল। আমাদের দেখে কাছে এল।

সার্কাসটির অবস্থা মোটেই সুবিধের মনে হল না। তাঁবুর কাপড় পুরনো ও জায়গায়-জায়গায় বড়-বড় তাপ্পি মারা। কোথাও কোথাও ফুটো। লাল কোট ও নীল পাতলুন পরা যে-লোকটি ভিতরে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে টিকিট চেক করছিল তার পোশাক বা চেহারা কোনওটাই তেমন চকচকে নয়। সার্কাসের সামনের দিকে খানিকটা জায়গা ঘেরা। লম্বালম্বি করে সাজানো ফাঁক-ফাঁক কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো উঁচু বেড়া। ঘেরার গায়ে টিকিট কাউন্টারে ভিড়। নানান বয়সী লোক বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। টিকিট কেটে লোক ঢুকছে ভিতরে। সার্কাসের সামনে চায়ের দোকান বসে গেছে। তেলেভাজা, চিনেবাদাম ভাজারও খুব বিক্রি চলছে। মাইকে ক্রমাগত কান-ফাটানো আওয়াজে ঘোষণা করা হচ্ছে, "এবার সেকেণ্ড শো শুরু হচ্ছে। চটপট টিকিট কেটে ঢুকে পড়ুন। চলে আসুন, চলে আসুন। আর দেরি নেই—"

টিকিট-কাউন্টারের মাথায় ঝুলছে কাঠের ফালির ওপর হাতে আঁকা সার্কাসের খেলার রঙচঙে বিজ্ঞাপন। নানারকম জন্তু-জানোয়ার ও নারী-পুরুষের দুর্ধর্ষ সব খেলার ভঙ্গি। এমন ছবি সব সার্কাসেই থাকে। এর মধ্যে ক'টা খেলা যে সত্যি দেখাবে, কে জানে! চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে সুনন্দকে জিজ্ঞেস করলাম, "হাতি আছে?"

সুনন্দ একটু অপ্রস্তুতভাবে মাথা নাড়ল।

"ধুস্। তাহলে আছেটা কী?"

"কেন সিংহ আছে, আমি খোঁজ নিয়েছি।" সুনন্দ উৎসাহভরে জানাল।

যা হোক আমরা ভিতরে ঢুকলাম। দর্শকের ভিড় ভালই হয়েছে। তাঁবুর মাঝখানে খুঁটি পুঁতে দড়ি লাগিয়ে অনেকটা জায়গা গোল করে ঘেরা। ওর ভিতর খেলা দেখানো হবে। ঘেরার একধারে কয়েক সারি টিনের চেয়ার পাতা। এগুলোই সব চাইতে দামি সিট—দু-টাকার। তিনজনে বসলাম চেয়ারে। এছাড়া কাঠের গ্যালারি আছে। একটাকার টিকিট এবং মাটিতে শতরঞ্চিতেও বসেছে দর্শক। তাদের টিকিটের হার মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা।

ঢং। ঘণ্টা দিয়ে সার্কাস আরম্ভ হল। তাঁবুর এককোণে একটা উঁচু মঞ্চের ওপর চেয়ারে বসে ছিল তিনটি যুবক। তাদের পরনে রঙিন শার্ট ও ট্রাউজার্স এবং প্রত্যেকের টেরির খুব বাহার। তাদের সামনে সাজানো ড্রাম, ঝাঁঝর, ফ্লুট ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র। ওরা ব্যাণ্ড-পার্টি। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনে [illegible] করল। সার্কাসের খেলোয়াড়দের রিংয়ে ঢোকার পথের পর্দা সরিয়ে ছুটে এল ঝলমলে পোশাক পরা দুটি বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়ে। জিমনাস্টিক্স্ দিয়ে শুরু হল।

এরপর একটার পর একটা খেলা। বছর-পনেরোর একটি মেয়ে এবং এক মহিলার এক চাকার সাইকেলের কসরত। একজন মাঝবয়সী পুরুষের মই নিয়ে ব্যালান্স, ইত্যাদি, ইত্যাদি। খেলোয়াড়দের অনেকের চেহারায় ভারী মিল। মনে হচ্ছিল হয়তো তারা একই পরিবারের লোক।

খেলাগুলো নেহাত মামুলি। তবে জমাচ্ছিল দুই জোকার। মুখে রং-মাখা, কিম্ভূত পোশাক পরা, মাথায় বিরাট গোল টুপি, পায়ে উলটামুখো জুতো। দু'জনের মধ্যে বেঁটেটিরই দাপট বেশি। লোকটি বামন, তিন ফুটের বেশি লম্বা নয়। সে চরকির মতো ঘুরছিল আর একখানা ফাটা কাঠ দিয়ে সার্কাসের যাকেই হাতের কাছে পাচ্ছিল তাকেই চড়াত করে এক ঘা কষাচ্ছিল এবং ক্যানকেনে স্বরে চিৎকার করে ছাড়ছিল রসিকতা। অন্যরা তাকে ডাকছিল মাস্টার পটল নামে।

খেলোয়াড়রা সবাই তেমন পোক্ত নয়। কয়েকজন বেশ কাঁচা। জমি থেকে পাঁচ-ছয় হাত উঁচুতে টান করে টাঙানো মোটা তারের ওপর দিয়ে ছাতা হাতে নাচতে নাচতে যাওয়ার খেলায় দুটি মেয়ে দু'ধার থেকে এল বটে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি মেয়ে আর কিছুতেই অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারল না। তিন-তিনবার সে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই টাল খেয়ে মাঝপথেই লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। তখন মাস্টার পটল তার হাত থেকে ছাতা কেড়ে নিয়ে নিজে তারে উঠে দিব্যি নেচে নেচে একধার থেকে অন্য ধারে চলে গেল। ব্যর্থ মেয়েটি করুণ মুখে বিদায় নিল। পুরুষদের ট্রাপিজের খেলাও তেমন জমল না। একেবারে দায়সারা ব্যাপার।

মামাবাবু উসখুস শুরু করলেন, "নাঃ, সুনন্দ, আর একটু বেটার আশা করেছিলাম। ওই মাস্টার পটলটি অবশ্য খাসা।"

সুনন্দ কাচুমাচুভাবে মিনমিন করে কী জানি আওড়াল।

সহসা ব্যাণ্ড সুর পালটাল এবং তারপরই পর্দা সরিয়ে একজন রিং-এ ঢুকল, সঙ্গে সরু দড়িতে বাঁধা বড়সড় এক লালমুখো বাঁদর।

লোকটির বয়স মনে হল বছর-তিরিশের মধ্যে। নাক-মুখ বেশ চোখা, লম্বা ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ। পরনে সাদা ট্রাউজার্স, সাদা ফুলহাতা শার্ট, কালো টাই। ঝকঝকে বাদামি জুতো। হাতে একটা ছোট বেতের ছড়ি। ইনি রিং-মাস্টার বা অ্যানিম্যাল-ট্রেনার সন্দেহ নেই। বাঁদরটার মাথায় কাপড়ের লাল টুপি, গলায় বকলস।

বাঁদরটি নানারকম খেলা দেখাতে লাগল। যেমন, বেহালা বাজানো, হুঁকো খাওয়া, ডিস্কো-ড্যান্স। ঘন-ঘন করতালি পড়ল। হঠাৎ ট্রেনার রিংয়ের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলল। দর্শকদের কোলাহল একটু কমলে ট্রেনার বলে উঠল, "লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন, সমবেত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ, আমার বাঁদর শুধু খেলা নয়, লেখাপড়াও শিখছে। কারণ ও জানে মুখ্যু হয়ে থাকলে ওর [illegible] নেই। প্রোমোশন হবে না। [illegible]

তাই ও ভাষা শিখছে। মানুষের ভাষা। যাতে বই-টই পড়তে পারে। তারপর পাশটাস দিতে মানুষের ইস্কুল-কলেজে পড়তে চায়। তবে এখনও ওর শিক্ষা বেশি এগোয়নি। মাত্র কয়েকটা কথা শিখেছে। তবে ওর চেষ্টা আছে, হবে।"

কথা বলতে বলতে সে হাতের দড়ি, যা দিয়ে বাঁদরটা বাঁধা রয়েছে সেটা রিংয়ের ভিতরে একটা খুঁটির গায়ে বেঁধে দিয়ে নিজে খানিক তফাতে সরে গেল। তারপর হেঁকে বলল, "মানিকচাঁদ, খিদে পেয়েছে ?"

মানিকচাঁদ ওরফে টুপি-পরা বাঁদরটি অমনি ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

ট্রেনার বলল, "ইয়েস্। মানিকচাঁদ বলছে, ওর খিদে পেয়েছে। অলরাইট, ইউ মাস্টার পটল, মানিকচাঁদকে একটা কলা খাওয়াও দেখি।"

অমনি বেঁটে জোকার মাস্টার পটল পাঁইপাঁই করে দৌড়ে চলে গেল পর্দা ঠেলে। সার্কাসের অন্দরমহলে। এবং প্রায় তক্ষুনি মস্ত একটা সিঙ্গাপুরি কলা হাতে নিয়ে উঁচু করে নাড়তে নাড়তে ঢুকল রিংয়ে। মানিকচাঁদকে ঘিরে এক চক্কর ঘুরল কলাটা দেখিয়ে দেখিয়ে। তারপর মানিকচাঁদকে এগিয়ে দিল কলাটা।

বাঁদরটা টপ করে কলাটা কেড়ে নিল। কলাখানা চটপট ছাড়িয়ে ভারী ফুর্তিতে সে সবেমাত্র এক কামড় বসিয়েছে, ট্রেনার আরও দূরে সরে গিয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "ব্যস্, আর নয়। এবার কলা রাখো, মানিকচাঁদ।"

আশ্চর্য ! অমনি বাঁদরটা কলা ফেলে দিল।

ট্রেনার এবার দর্শকদের উদ্দেশ করে বলল, "আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি ইশারা করেছি। গলার স্বরের ইঙ্গিতে হুকুম করেছি। ওইভাবে কলা খেতে বলেছি বা বারণ করেছি। কিন্তু মোটেই তা নয়। আমি আগেই বলেছি, মানিকচাঁদ কিছু-কিছু মানুষের ভাষা শিখেছে। তাই ও আমার কথা বুঝে কাজ করছে। ও, আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? অলরাইট, আপনারাই কেউ ওকে অর্ডার করুন কলা খেতে। আবার হুকুম করুন খাওয়া বন্ধ করতে। দেখুন পরীক্ষা করে ও বুঝতে পারে কি না। ইংরিজি, বাংলা বা হিন্দি, যে-কোনও ভাষায়।"

ট্রেনারের কথা শেষ হতে না হতেই দর্শকদের মধ্যে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। বহু কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল—

"মানিকচাঁদ কলা খাও।"

"এ মানিকচাঁদ কেলা খাও।"

"মানিকচাঁদ ইট বেনানা।"

মানিকচাঁদ নির্বিকারভাবে বসে বসে কান চুলকোতে লাগল। কলার প্রতি কোনও আগ্রহই দেখাল না।

ট্রেনার হাত তুলল। দর্শকদের জানাল, "এভাবে নয়। এভাবে নয়। মানিকচাঁদ আগে মিলিটারিতে ক্যাপ্টেন ছিল। মাংকি রেজিমেন্ট, বেনারস। খুব ডিসিপ্লিন মানে। এক-এক করে বলতে হবে, নইলে ও অর্ডার মানবে না। মিলিটারি নিয়ম।"

অমনি গ্যালারিতে একটি শুঁটকো ঢ্যাঙা লোক উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, "বাবা মানিকচাঁদ, কলাটা খেয়ে

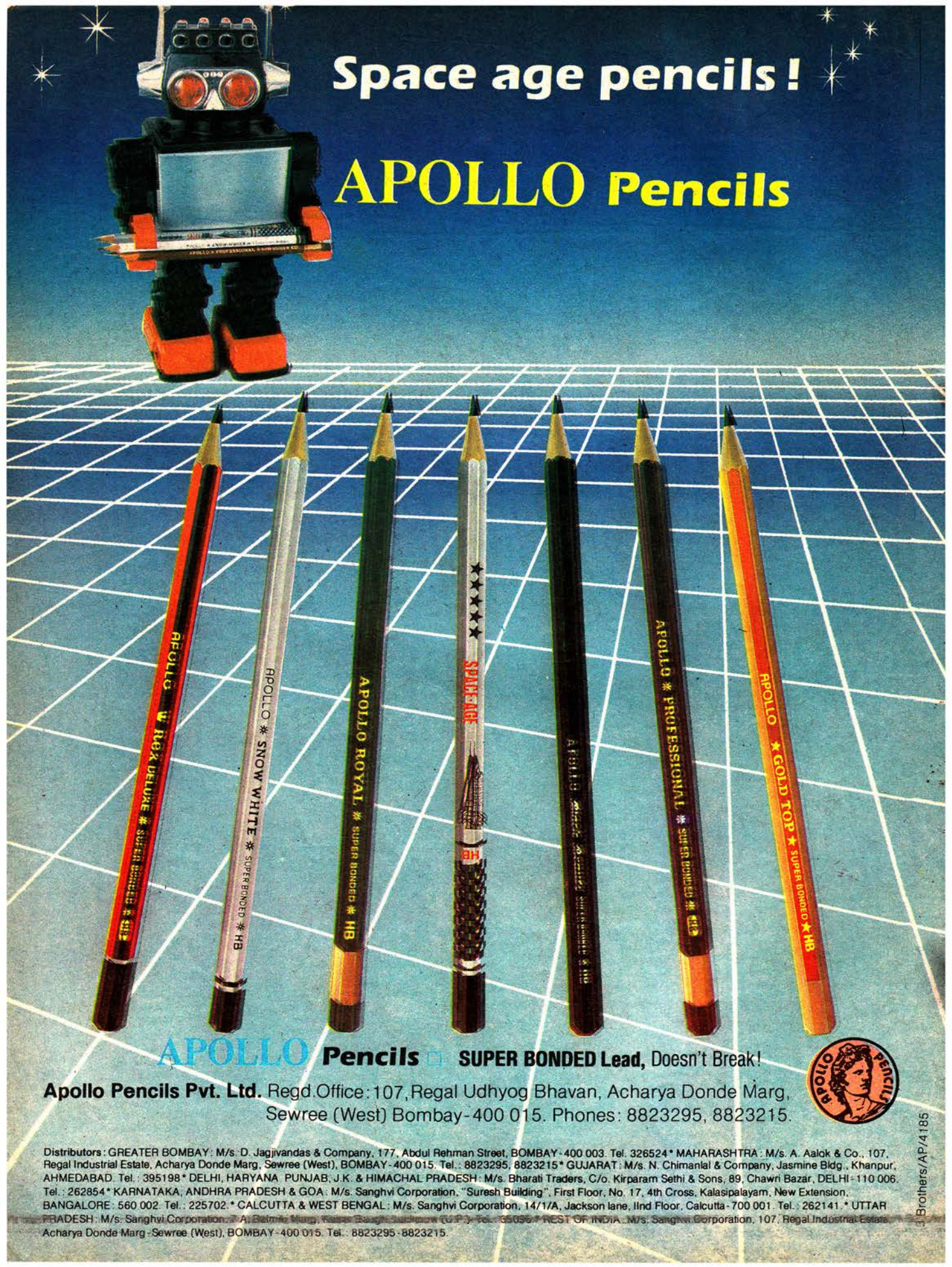

APOLLO Pencils ☐ **SUPER BONDED Lead,** Doesn't Break!

Apollo Pencils Pvt. Ltd. Regd.Office: 107, Regal Udhyog Bhavan, Acharya Donde Marg, Sewree (West) Bombay-400 015. Phones: 8823295, 8823215.

Distributors: GREATER BOMBAY: M/s. D. Jagjivandas & Company, 177, Abdul Rehman Street, BOMBAY-400 003. Tel. 326524 * MAHARASHTRA: M/s. A. Aalok & Co., 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg, Sewree (West), BOMBAY-400 015. Tel.: 8823295, 8823215 * GUJARAT: M/s. N. Chimanlal & Company, Jasmine Bldg., Khanpur, AHMEDABAD. Tel.: 395198 * DELHI, HARYANA PUNJAB, J.K. & HIMACHAL PRADESH: M/s. Bharati Traders, C/o. Kirparam Sethi & Sons, 89, Chawri Bazar, DELHI-110 006. Tel.: 262854 * KARNATAKA, ANDHRA PRADESH & GOA: M/s. Sanghvi Corporation, "Suresh Building", First Floor, No. 17, 4th Cross, Kalasipalayam, New Extension, BANGALORE: 560 002. Tel.: 225702. * CALCUTTA & WEST BENGAL: M/s. Sanghvi Corporation, 14/1/A, Jackson lane, IInd Floor, Calcutta-700 001. Tel.: 262141. * UTTAR PRADESH: M/s. Sanghvi Corporation, 7-A, Balmiki Marg, Kaiser Bagh, Lucknow (U.P.). Tel.: 35095 * REST OF INDIA: M/s. Sanghvi Corporation, 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg-Sewree (West), BOMBAY-400 015. Tel.: 8823295-8823215.

3 Brothers/AP/4185

ফেলো। খাও, খাও।"

অবাক কাণ্ড। মানিকচাঁদ কলাটা কুড়িয়ে নিয়ে গোগ্রাসে কামড় দিল।

ঢ্যাঙা লোকটি ফের চেঁচাল, "বাস, আর খেও না।" অমনি মানিকচাঁদের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে কলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এবার চেয়ারে-বসা প্যান্ট-শার্ট পরা এক যুবক চেঁচাল, "ক্যাপ্টেন মানিকচাঁদ, ইট ইওর ব্যানানা।"

তৎক্ষণাৎ বাঁদরটি কলাটা তুলে নিয়ে ফের খেতে শুরু করল।

"স্টপ।" হুকুম দিল যুবক।

ব্যস, মানিকচাঁদের খাওয়া বন্ধ। যদিও হাতে তার আধখানা কলা। "ডোন্ট ইট ইওর ব্যানানা।" হঠাৎ মামাবাবুর হুঙ্কার শুনে, সব দর্শক অবাক হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। মামাবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ফের হুকুম দিলেন, "নাউ স্টার্ট ইটিং।"

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে মানিকচাঁদ গপ্‌গপ্‌ করে বাকি কলাটুকু শেষ করে ফেলল।

মামাবাবু হতভম্বের মতো বললেন, "স্ট্রেঞ্জ।"

সুনন্দ ফিসফিস করে বলল, "সত্যি অদ্ভুত। আজব ব্যাপার। দোকানের লোকগুলো বলছিল বটে এইরকম দেখায় কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।"

ট্রেনারসহ মানিকচাঁদ ফিরে গেল।

এরপর কালো ট্রাউজার্স ও ঘিয়ে রঙের ফুলহাতা শার্ট পরা একজন মাঝারি লম্বা, শক্তসমর্থ গম্ভীরদর্শন বয়স্ক পুরুষ এসে কতগুলো কাঠের বল এবং রবারের রিং নিয়ে জাগলিং অর্থাৎ লোফালুফির কসরত দেখিয়ে গেল।

আবার ব্যাণ্ড খুব তেজের সঙ্গে বেজে উঠল। সেই আগের ট্রেনার বা রিং-মাস্টারটি ঢুকল। তার পিছনে পিছনে এল একটা ছোট ধবধবে সাদা লোমওলা কুকুর।

কুকুরটি ট্রেনারের নির্দেশমতো নানারকম খেলা দেখাতে লাগল। যেমন, দুপায়ে হাঁটা, আগুনের বলয়ের মধ্য দিয়ে ঝাঁপ। হারমোনিয়াম বাজানো ইত্যাদি।

অনেকগুলো খেলার পর ট্রেনার কুকুরটিকে দেখিয়ে বলল, "এই পঞ্চুও কিছু-কিছু মানুষের ভাষা শিখেছে। আপনারা পরখ করে দেখতে পারেন। আমি দূরে থাকব। যেমন ধরুন, পঞ্চু খুব সৎ আর পাহারাদার কুকুর। তাই চোর বদনাম দিলে ও ভীষণ চটে যায়। আপনারা ওকে চোর বলে দেখতে পারেন, কী করে। বাংলা বা ইংরিজিতে বলবেন। হিন্দিটা এখনও ওর ভাল রপ্ত হয়নি। তবে সবাই একসঙ্গে চেঁচাবেন না। হ্যাঁ, ও চটে গেলেই কিন্তু মাপ চেয়ে নেবেন। নইলে ও তেড়ে গিয়ে কামড়ে দিতে পারে। তখন আমায় দোষ দেবেন না।"

কথা শেষ করে ট্রেনার পঞ্চু-কুকুরকে একটা টুলের ওপর বসিয়ে রেখে নিজে ওর পিছনে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এবং দর্শকদের ইশারা করল—বলুন।

গ্যালারির সেই ঢ্যাঙা লোকটি তাক করেই ছিল। তক্ষুনি চিৎকার দিল, "এই ব্যাটা পঞ্চু চোর।"

বলামাত্র কুকুরটা দাঁত বের করে গরগর করে উঠল। তার গায়ের লোম খাড়া। চোখ জ্বলছে যেন রাগে।

ঢ্যাঙা ভয় পেয়ে অমনি হাত জোড় করে বলে উঠল, "দোহাই বাপ, মাপ করো, ঘাট হয়েছে।"

ব্যস, পঞ্চু ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

"ওকে ইংরিজিতে চোর বলো তো।" মামাবাবু সুনন্দকে নির্দেশ দিলেন।

সুনন্দ হাঁক ছাড়ল, "পঞ্চু ইউ থিফ্‌।"

ফের পঞ্চু দাঁত খিঁচিয়ে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

"ইয়েস ইউ আর এ থিফ্‌।" এবার মামাবাবুর গলা।

পঞ্চু রীতিমত খেপে গেল। সে টুল থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে গর্জন ছাড়ল।

"এক্সকিউজ মি পঞ্চু।" সুনন্দ ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচাল।

অমনি পঞ্চু শান্ত হয়ে ফের টুলে চড়ে বসল।

"আশ্চর্য! হতভম্ব মামাবাবু একেবারে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন, আমার ও সুনন্দর মুখেও রা নেই। অন্য দর্শকরাও থ। মামাবাবু বললেন, "ভাবছিলাম হয়তো এমনভাবে শেখানো হয়েছে যে, প্রথম কথাটায় রাগ দেখায় এবং দ্বিতীয় কথাটায় শান্ত হয়। কিন্তু কই না! একদম ঠিকঠাক রিঅ্যাকশন হল। ঠিক যেন মানে বুঝে! আর যেন সত্যি সত্যি রেগে যাচ্ছিল চোর বললে। রাগের ভান বলে তো মনে হল না।"

পঞ্চুকে নিয়ে ট্রেনার ফিরে গেল।

আবার সেই বয়স্ক কালো ট্রাউজার্স পরা লোকটির আবির্ভাব। এবার দেখাল ছোট-ছোট রঙিন মাছসমেত বড় এক জগ জল খাওয়া এবং তা সবসুদ্ধ ওগরানোর খেলা। দু-চারটে হাততালি জুটল বটে, কিন্তু তখন দর্শকদের মন পড়ে রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের খেলার দিকে। না জানি আবার কী চমক অপেক্ষা করছে! তাদের আশা পূরণ করতেই যেন ফের ট্রেনার ঢুকল। এবার তার সঙ্গে দড়িতে বাঁধা এক বিরাট কালো ভাল্লুক।

ট্রেনারের ইঙ্গিতমতো ভাল্লুকটা একটা মস্ত তিনচাকার সাইকেল চেপে চক্কর দিতে লাগল। কিন্তু অধৈর্য দর্শকরা চিৎকার করে জানতে চাইল, "এও মানুষের ভাষা বোঝে নাকি?"

"ইয়েস। হ্যাঁ, বোঝে," জানাল ট্রেনার, "তবে ব্যাটার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। বেশি শিখতে পারেনি। মিস্টার জাম্ববান জোয়ান আদমি। খুব তাকত। রোজ ভোরে ও এক্সারসাইজ করে। আপনারা ওর এক্সারসাইজ দেখতে চাইলে দেখাবে। থামতে বললে থামবে। তবে দয়া করে বেশি খাটাবেন না। তাহলে ওর মেজাজ বিগড়ে যাবে।"

ট্রেনার জাম্ববান নামে ভাল্লুকটির গলা ও নাকের ফুটোয় বাঁধা দড়িটা একটা খুঁটিতে আটকে দিয়ে পিছনে দূরে সরে গেল। অতঃপর হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল দর্শকদের, এবার বলতে পারেন।

"এ বেটা জাম্ববান, থোড়া এক্সারসাইজ দেখলাও।" পঞ্চাশ পয়সার আসন থেকে পালোয়ান গোছের একটি লোকের কণ্ঠ শোনা গেল। জাম্ববান গম্ভীরভাবে মাটিতে উবু হয়ে বসে ছিল। এবার সে তার সামনের ডান হাত (বা পা) তুলে একবার লম্বা করতে লাগল, আবার মুড়তে লাগল। এই রকম করেই চলল।

"ব্যস্‌, ব্যস্‌, ঠিক হ্যায়। লেকিন আউর কুছ কসরত তো

ত্বকের সংক্রমণ যেমনি অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর তেমনি বিচ্ছিরি

প্র্যাগমেটর কাজ করে চারভাবে, তাই সংক্রমণ দূর করে ও চটপট সারিয়ে তোলে।

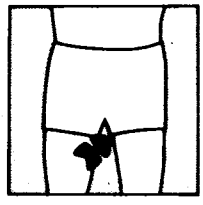

ধোবিজ ইচ্—সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে হয়। 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করে সারিয়ে তুলুন।

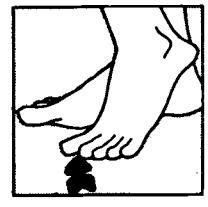

হাজা—ভেজা পায়ে হতে চায়। দ্রুত আরাম পেতে 'প্র্যাগমেটর' লাগান।

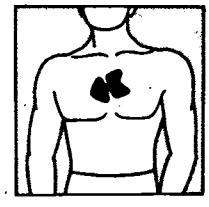

দাদ—শরীরের যে-কোনো জায়গাতেই হতে পারে। অবহেলা করবেন না—উপশমের জন্যে 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চললে অথবা সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে এধরণের ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ হতে পারে—যে-কোনো সময়েই। প্র্যাগমেটর চারভাবে কাজ করে বলে এসব বালাই দূর হয়ে যায়। ডাক্তাররাও তাই প্র্যাগমেটরই ব্যবহার করতে বলেন।

তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢোকে
'প্র্যাগমেটর' তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢুকে সংক্রামিত জায়গায় ও তার চার পাশে কাজ শুরু করে দেয়।

ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে
'প্র্যাগমেটর' সংক্রামিত ত্বক সারিয়ে দেয় এবং ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে দিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্য ফেরায়।

1 2 3 4

চটপট চুলকানি বন্ধ করে
'প্র্যাগমেটরে' সংক্রামিত জায়গা আঁচড়ানোর ইচ্ছেকে প্রশমিত করে তাই সংক্রমণও ছড়াতে পারে না।

ছত্রাকজনিক সংক্রমণ রোখে
'প্র্যাগমেটরে' আছে সুপরিচিত ও কার্যকর ছত্রাক-প্রতিরোধী জিনিষ গন্ধক যা গুঁড়ো আকারে থাকায় সংক্রামিত জায়গায় আরো ভালভাবে লাগে।

আয়োডেক্স নির্মাতাদের তৈরি

PRAGMATAR®
Ointment of Cetyl Alcohol, Cetyl Tar Distillate, Sulphur and Salicylic Acid 28g.

'প্র্যাগমেটর' মানেই হাতের কাছে দ্রুত আরাম

SKF – AN ESKAYEF PRODUCT
© Eskayef Limited

দেখলাও।" মিনিটখানেক বাদেই হুকুমদাতা দর্শক অনুরোধ জানাল।

জাম্ববান এবার তার ঘাড় ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগল। দর্শকটি খানিক দেখে বলল, "বাহবা বাহবা, বহুত আচ্ছা। ঠিক হ্যায়, আভি রোক্ যা বেটা।"

জাম্ববান অমনি এক্সারসাইজ থামিয়ে শান্ত হয়ে বসে রইল।

ট্রেনার দর্শকদের উদ্দেশে বলল, "মিস্টার জাম্ববান পেয়ারা খেতে খুব ভালবাসে। কেউ ওকে পেয়ারা খাওয়াবে শুনলে ভারী খুশি হয়। আপনারা ওকে পেয়ারা খাওয়াবেন এই কথা বলে দেখুন, কী করে?"

সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারির সেই অতি তৎপর ঢ্যাঙা লোকটি চেঁচাল "এই জাম্ববান—"

কিন্তু ঢ্যাঙার বাকি কথা বার হওয়ার আগেই অপর এক কণ্ঠ শোনা গেল গ্যালারি থেকে, "তোকে পেয়ারা খাওয়াব।"

ঢ্যাঙা মহা চটে কটমট করে দেখতে লাগল চকরাবকরা শার্ট গায়ে ফাজিল ছোকরাকে, যে তার কথায় ভাগ বসিয়েছে।

যাই হোক, কাজ হয়ে গেল। ভাল্লুকটি নেচেকুঁদে গদগদ।

দর্শকরা হেসে অস্থির। মাস্টার পটল বলে উঠল, "বেশ, বেশ, এবার থাম বাপধন, খাওয়াবে তো বলেছে।"

জাম্ববানের নাচাকোঁদা থেমে গেল।

মাস্টার পটল গ্যালারির কাছে গিয়ে হাত পেতে খনখনে গলায় বলল, "ও মশায়, পঞ্চাশ পয়সা ছাড়ুন, পেয়ারার দাম। পাঁচজনার সামনে কথা দিয়েছেন। না দিলে কেস করব কিন্তু।"

ঢ্যাঙা চকরাবকরা শার্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ও দেবে।"

চকরাবকরা খেঁকিয়ে উঠল, "ইঃ আবদার, আপনি দিন।"

ঝগড়া লেগে গেল। দু'জনেই বলে, "আমি দেব কেন?"

মাস্টার পটল দু'হাত বাড়িয়ে বলল, "দুজনেই ছাড়ুন দাদা, পঞ্চাশ করে। দুজনেই কথা দিয়েছেন, সব্বাই সাক্ষী।"

দর্শকও পটলের সমর্থনে চেঁচাতে শুরু করল, "দিয়ে দিন পঞ্চাশ পয়সা। দু'জনকেই দিতে হবে। প্রমিস করেছেন। আরে ছি-ছি, পঞ্চাশ পয়সার জন্যে ভাল্লুকের কাছে কথার খেলাপ! মানুষের নাম ডোবালেন মশাই।"

ঢ্যাঙা পয়সা বের করত কি না সন্দেহ। তবে দেখা গেল তার স্ত্রীর মুখ-ঝামটা খেয়ে অগত্যা একটা পঞ্চাশ পয়সা ছুঁড়ে দিল পটলকে। তখন চকরাবকরা শার্টও প্রেস্টিজ রাখতে আর-একটা পঞ্চাশ পয়সা ছুঁড়ল। মাস্টার পটল পঞ্চাশ পয়সা দুটো পকেটে পুরে টুপি তুলে দু'বার সেলাম জানাল। শতরঞ্চির আসন থেকে এক দর্শক হুঁশিয়ার করে দিল, "অ্যাই পটল, জাম্ববানকে পেয়ারা কিনে দিবি ঠিক। পয়সাটা মেরে দিসনি যেন।"

পটল ফ্যাক করে হেসে বলল, "আধাআধি বখরা।"

মামাবাবুর দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি ভুরু কুঁচকে দেখছেন। এত রগড়েও মুখে হাসি নেই। কেমন অন্যমনস্ক ভাব। কী ভাবছেন কে জানে!

এর পর লোহার শিক দিয়ে তৈরি ফ্রেম জুড়ে-জুড়ে চটপট একটা গোল উঁচু ঘেরা তৈরি করা হল। একটা খাঁচা টেনে এনে লাগানো হল ঘেরার দরজায়। খাঁচা খুলতে এক সিংহ

বেরিয়ে এসে রিংয়ে ঢুকল। রিং-মাস্টারও ঢুকল ঘেরায়। এখন তার হাতে ছড়ির বদলে একটা চামড়ার লম্বা চাবুক।

সিংহটা খুব বুড়ো। তার গায়ের চামড়া ঢিলে। ঘাড়ের কেশর পাতলা হয়ে গেছে। চলাফেরা ধীর। কয়েকটা খেলা দেখাল সিংহটা। দু'পায়ে দাঁড়ানো। এক টুল থেকে অন্য টুলে লাফ। এই রকম কিছু। কিন্তু দর্শক উসখুস করছে। এসব মামুলি খেলায় তাদের আর মন ভরছে না। তারা জানতে চাইল, এও কি মানুষের ভাষা বোঝে ?

রিং-মাস্টার জবাব দিল, "হ্যাঁ বোঝে, তবে দু-চারটে মাত্র। বয়স হয়ে গেছে তাই শেখার ধৈর্য নেই। কেবল ঘুম মারে। আপনারা ওকে ঘুমোতে অর্ডার করুন, দেখুন কেমন খুশি হয়ে কথা শুনবে।"

"ওর নাম কী ?" দু' টাকার সিট থেকে একজন জিজ্ঞেস করল।

"মহারাজ," উত্তর দিল ট্রেনার।

ট্রেনার রিংয়ের বাইরে গিয়ে সিংহের পিছনে দাঁড়াল। অর্থাৎ, পশুরাজের চোখের আড়ালে গেল।

"মহারাজ, স্লিপ, স্লিপ।" দু টাকার সিট থেকে অর্ডার হল।

"মহারাজ, নিদ্ যা।" দ্বিতীয় কণ্ঠ শোনা গেল।

সিংহটি একটি চওড়া টুলের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল। কয়েক মুহূর্ত বাদে সে গোটা দুই মস্ত-মস্ত হাই তুলল। তারপর টুল থেকে মাটিতে নেমে দুই থাবা টান করে পেতে তার ওপর মাথা রেখে চোখ বুজল। এবং রীতিমত ভোঁস্-ভোঁস্ করে ঘুমোতে শুরু করল।

আধমিনিটটাক দেখেই ফের হুকুম হল, "মহারাজ গেট আপ্।"

গ্যালারি থেকে একজন ফুট কাটল, "গা তোলো বাবা মহারাজ। এখনই ঘুম কী ? মাত্র সাড়ে ছ'টা বাজে।" হাসির রোল উঠল।

মহারাজ চোখ খুলল। পিটপিট করল। যেন নেহাত অনিচ্ছা উঠতে। রিং-মাস্টার কাছে এসে তাড়া লাগাল, "গেট আপ্ মহারাজ, গেট আপ্।"

তখন মহারাজ গা ঝাড়া দিয়ে ফের টুলে চড়ে বসল। বাজনায় ঝড় তুলে ব্যাণ্ডপার্টি ঝপ্ করে আওয়াজ থামাল। ব্যস্, শো শেষ।

ফেরার পথে সুনন্দ ও আমি উত্তেজিত। সত্যি দারুণ খেলা। সুনন্দ বলল, "মনে হয় যেন ম্যাজিক দেখছি।"

মামাবাবু শুধু একবার মন্তব্য করলেন, "ম্যাজিক-ট্যাজিক নয়, নিশ্চয় কোনও ট্রিক আছে। জন্তু-জানোয়ার মানুষের ভাষা বোঝে ? ইম্পসিবল। শোনো,ওই ট্রেনারটিকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো ? ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

এক দিন বাদেই সকালে সুনন্দ জুবিলি সার্কাসের রিং-মাস্টার অর্থাৎ অ্যানিম্যাল ট্রেনারকে আমাদের বাড়িতে এনে হাজির করল। সুনন্দ নাকি সেদিন ভোর থেকে সার্কাসের বেড়ার বাইরে ঘোরাফেরা করছিল। রিং-মাস্টারটি একবার বাইরে আসতেই তার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমায়। এ-ব্যাপারে সুনন্দ ওস্তাদ। তারপর শান্তিনিকেতন দেখানোর ছুতো করে তাকে ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে নিজেদের বাড়িতে কফি খাওয়াবে বলে টেনে এনেছে।

মামাবাবু ও আমি বেরিয়ে এসে রিং-মাস্টারকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালাম। রিং-মাস্টারটির মুখ হাসি-হাসি, মনে হয় ফুর্তিবাজ ধরন। সবাই বসলাম বারান্দায় বেতের চেয়ারে। মামাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম ?"

উত্তর এল, "মাইকেল দাস।"

"বাঙালি ?"

"নিশ্চয়। কলকাতায় বাড়ি।"

"সার্কাসে ঢুকেছেন কদ্দিন ?"

"প্রায় সাত বছর।"

"আপনার ট্রেনিং অদ্ভুত। জানোয়ারদের খেলা দেখাচ্ছেন কদ্দিন ?"

"তিন বছর। আগে জিমনাস্টিক্স করতাম।"

"আপনি অ্যানিমাল ট্রেনিং শিখেছেন কার কাছে ?"

"আমার গুরু নায়ারজি'র কাছ থেকে।"

"উনি এই সার্কাসে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। আগে অবশ্য অনেক বড়-বড় সার্কাসে কাজ করেছেন। বয়স হয়ে শরীর খারাপ যাচ্ছিল। তখন এই ছোট দলে আসেন। আমাদের মালিক মুথুস্বামী ওঁর খুব বন্ধু।"

"নায়ারজি এখন কোথায় ?"

"রিটায়ার করে দু-বছর আগে দেশে চলে গেছেন। সার্কাসের ঘোরাঘুরি আর তাঁর শরীরে পোষাচ্ছিল না।"

"এই সব জন্তু-জানোয়ারকে খেলা শিখিয়েছে কে ? নায়ারজি ?"

"হ্যাঁ, এরা নায়ারজির হাতেই তৈরি।"

"মানে এই মানুষের ভাষা বোঝার খেলা, এও কি নায়ারজির শেখানো ?"

মাইকেল দাস কেমন আড়ষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল।

"ও, নায়ারজি শেখাননি ! তবে কি আপনি ?"

মামাবাবুর প্রশ্নে দাস মুখ নিচু করে ফের মাথা নাড়ে।

"তাহলে ?"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দাস বলল, "এসব সাধুজির কৃপা।"

"মানে !" প্রশ্নটা আমাদের তিনজনের গলা দিয়েই একসঙ্গে বেরয়।

"মানে সাধুজির আশীর্বাদে ওরা কিছু-কিছু মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। মাপ করবেন, এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।"

মামাবাবু এই নিয়ে আর চাপাচাপি করলেন না। বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও প্রসঙ্গ থাক, আপনি বরং সার্কাসের গল্প বলুন। সার্কাসের লাইফ কেমন জানতে ইচ্ছে করে ?"

মাইকেল দাস সার্কাসের গল্প শুরু করে। ক্রমে বেশ সহজ হয়ে ওঠে। সত্যি বিচিত্র জীবন তাদের। কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাধারণ লোকের যা ধারণার বাইরে।

কফি ও কেক এল। খেতে খেতে মাইকেল দাসের গল্প চলে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি। ঘণ্টাখানেক বাদে সে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

দাস চলে যাওয়ার পর মামাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, রহস্যটা ক্লিয়ার হল না হে। ও এড়িয়ে গেল। সুনন্দ, অসিত তোমরা সার্কাসটার ওপর নজর রাখবে। দ্যাখো কোনও ক্লু পাও কি না।"

(শেষাংশ আগামী সংখ্যায়)

ছবি : দেবাশিস দেব

বুলটি

গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিরাম সর্দার
বাড়ি তার কুলটি,
পুষেছে বিড়ালছানা,
নাম তার বুলটি।
রোজ রাতে রবিরাম
ছেড়ে রাখে তারে,
যদি সে একটা-দুটো
নেংটিকে মারে।
মাঝরাতে আলো জ্বেলে
খোঁজ নিয়ে দেখি
বুলটি ঘুমিয়ে আছে
বিছানায়, একী!
খাবারে বাবুর বড়
বেশি বাড়াবাড়ি,
জ্যান্ত মছলি চাই,
রুটি-তরকারি।
ফিটফাট বাবু যেন
বাড়ির জামাই,
খাবারে হয় না তার
কখনো কামাই।

ফ্রি গিফট

রূপক চট্টরাজ

দুধ খেতে গররাজি
বিনা মারামারিতে,
তাই নিয়ে গোলমাল
দু' বেলাই বাড়িতে।
টুটু-মিঠু খাবে না যে,
যত খুশি করো ট্রাই,
খাবে শুধু কাটলেট
ওমলেট-ফিশফ্রাই।
ভাজাভুজি খেয়েদেয়ে
বেড়ে যায় তেষ্টা,
জল খেয়ে ঢকঢক
গোল বাধে শেষটা।
বকাঝকা দাও যদি
রাগটুকু সম্বল,
ভাজাভুজি খেয়ে বলে,
ফ্রি পাই অম্বল!

সার্জারি

অশোককুমার মিত্র

চারজন সার্জেন
সার্জারি শেখে,
টন-টন বই আনে
লণ্ডন থেকে।
বলে, আর রাখব না
গোদ, বিষফোঁড়া,
গেঁটে বাত, ট্যারা চোখ,
পিলে পেটজোড়া,
চুলকানো কান আর
হাঁচি-লেপা নাক,
গার্জেন সার্জেন
করে দেব ফাঁক।
সেই ব্রত নিয়ে তারা
দিনরাত পড়ে,
বুড়ো হল, নুলো হল,
দাঁত গেল নড়ে।

ছবি : দেবাশিস দেব

"এ-জায়গাটা তেমন ভাল নয়, বাবু।"

ভাঙা দেউলের প্রহরী

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে বাসটা ফেল করলাম। দেখতে পেলাম বেশ খানিকটা দূরেই গ্রাম্য পথে ধুলোর ঝড় তুলে বাসটা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমিল জেটোপেকও দৌড়ে ওই বাস ধরতে পারবে না, তাই দাঁড়িয়ে হাত কামড়ানো ছাড়া করার কিছুই ছিল না আমার আর হারাধনের।

এসেছিলাম সরকারি জরিপের কাজে, সামান্য দেরি হওয়াতেই এই বিপত্তি। ভেবে আর কিছু যে লাভ নেই সেটা বুঝেই বাস স্টপের চারপাশে তাকালাম। বাস স্টপ বলতে কটা গাছ আর একটা চালাঘরের চায়ের দোকান। এখানেই বাস দাঁড়ায়। চায়ের দোকানে দু'জন লোক চা খেতে খেতে শহুরে বাবুদের বিপদ দেখে বোধহয় সেটা উপভোগ করছিল। পায়ে-পায়ে এবার চায়ের দোকানের দিকেই এগোলাম।

আমাদের দেখে চা-ওয়ালা এগিয়ে এল। তাকে দু-গেলাস চায়ের অর্ডার দিয়ে বেঞ্চিতে বসলাম আমি আর হারাধন। চা-ওয়ালা চা এনে হাজির করতেই পরের বাস কটায় জানতে চাইলাম। লোকটা জানাল পরের বাস সেই সন্ধে সাড়ে-ছটায়। অর্থাৎ এখনও সাড়ে-তিন ঘন্টা!

আজই আমাদের ফেরার কথা, কিন্তু সাড়ে-ছটার বাস ধরলে তা আর হবার নয়। চা-ওয়ালাকে তাই প্রশ্ন করলাম স্টেশনে যাওয়ার আর কোনও শর্টকাট রাস্তা আছে কি না।

লোকটা, যারা চা খাচ্ছিল তাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করে এসে জানাল—একটা পথ আছে। যেতে হবে খেতের আলের উপর দিয়ে হাঁটাপথে। মাঝখানে একটা গ্রামও পার হতে হবে।

আমার কথার উত্তরে সে জানাল, স্টেশন এখান থেকে এই হাঁটাপথে তিন ক্রোশ পথ, অর্থাৎ প্রায় মাইল-ছয়েক। তাড়াতাড়ি হাঁটলে দু-ঘণ্টায় স্টেশনে পৌঁছনো যাবে। এতে একটা ভাল জিনিসও দেখা যাবে।

সেটা কী জানতে চাইতেই চা-ওয়ালা বলল এখান থেকে দু'মাইল তফাতে আমাদের পথেই পড়বে মা ভবানীর এক প্রাচীন মন্দির। অতি জাগ্রত নাকি দেবী ভবানী।

হারাধনের দিকে তাকালাম। তার মুখ দেখে বুঝলাম সারা দিন পরিশ্রমের পর সে আর হাঁটাহাঁটিতে রাজি নয়। কিন্তু এখন বেলা মাত্র তিনটে, সাড়ে তিন ঘণ্টা একভাবে বসে থাকাও যে বিরক্তিকর। এখানে সাইকেল-রিকশা জাতীয় কোনও যানবাহনও নেই।

চা-ওয়ালাকে অন্য কোনও গাড়ির কথা বলতেই সে হেসে উঠল। "এখানে আর গাড়ি কই, বাবু। গাড়ি বলতে ওই বাস, সকাল বিকেলে তিনবার যাতায়াত করে।"

শেষ পর্যন্ত হাঁটাপথেই এগোব ঠিক করলাম। হারাধনও আমার আগ্রহ দেখে নিমরাজি হয়ে উঠে দাঁড়াল।

চা-ওয়ালার কাছে এবার ভাল করে পথের নিশানা জেনে নিলাম। বাসের রাস্তা ধরে মাইলখানেক যাওয়ার পর বাঁয়ে মোড় ঘুরতে হবে ওই দেবী ভবানীর মন্দিরের কাছে। তারপর সোজা রাস্তা। রাস্তা বলতে অবশ্য খেতের আলপথ।

এরকম পথে সরকারি কাজে অনেকবারই হেঁটেছি, তাই

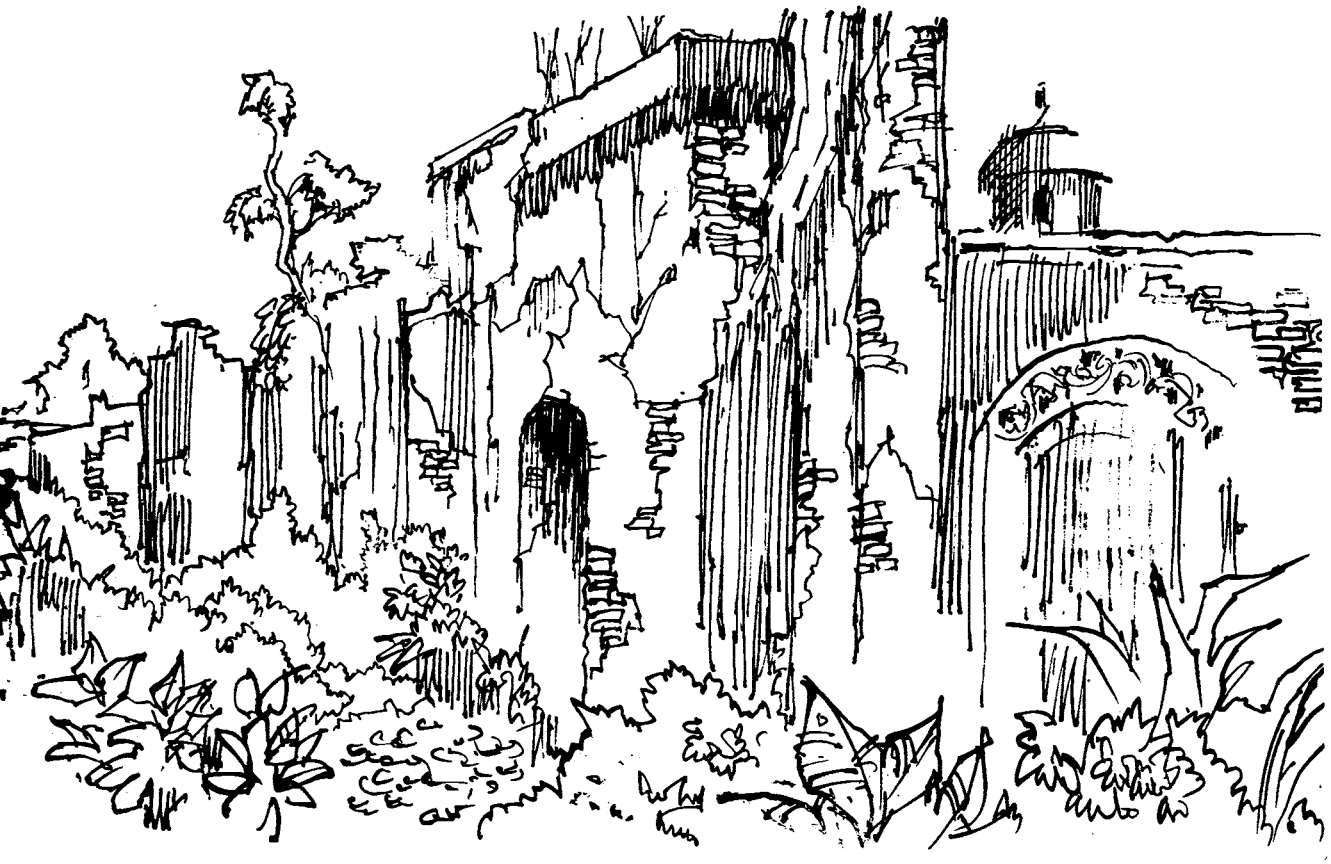

আমার তেমন আর আপত্তি ছিল না।

শেষ পর্যন্ত চা-ওয়ালার পয়সা মিটিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। রোদ বেশ চড়া, তাহলেও তেমন গরম নেই, কারণ শীতের আমেজ তখনও মিলিয়ে যায়নি।

মাইলখানেক পথ সহজেই পার হলাম। রাস্তার একপাশে বিস্তীর্ণ খেত, অন্যপাশে বেশ গাছপালা আর মাঝেমধ্যে চালাঘর।

একটু পরেই পৌঁছলাম চা-ওয়ালার বলা সেই মন্দিরের কাছে। দু'পাশে বেশ ঘন ঝোপঝাড় আর নানা ধরনের প্রাচীন বাড়িঘরের অংশবিশেষ। জায়গাটা যে এককালে বেশ ছিল আন্দাজ করা যায়। হয়তো কোনও জমিদারের রাজত্ব ছিল, কালের প্রকোপে এখন এর ভগ্নদশা।

মন্দিরের কাছে যেতেই চমক লাগল। বিরাট আকারের জীর্ণ একটা মন্দির। কত বছর আগেকার কে জানে। মন্দিরের একটা পাল্লা ভাঙা, ফাটলের মধ্যে নেমেছে বটের ঝুরি।

হারাধন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "স্যার, সাবধান।"

চমকে তাকিয়ে দেখলাম বিরাট একটা সাপ আস্তে-আস্তে একপাশ দিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল।

একটু এগিয়ে মন্দিরের মধ্যে তাকালাম। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে লক্ষ করলাম ভিতরে রয়েছে এক দেবীমূর্তি। খুব ভাল করে দৃষ্টিগোচর হল না। তবে মূর্তিটি অক্ষত আর ভক্তি জাগায় সন্দেহ নেই। প্রণাম জানালাম দেবী ভবানীকে হারাধন আর আমি। পিছিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখতে পেলাম মন্দিরের বাইরে বাঁ পাশে বিশাল আর-একটা মূর্তি।

প্রায় ছ'ফিট দীর্ঘ মূর্তিটা। হাতে ত্রিশূল জাতীয় একটা দণ্ড। দেখে মনে হয় যেন এই ভবানী মন্দিরের এক প্রহরী। আশ্চর্য পেশীবহুল যেন মূর্তিটা, কতকাল ঝড়-জল সহ্য করেও বাইরে দাঁড়িয়ে এই মন্দির পাহারা দিয়ে চলেছে। মিশমিশে কালো রঙ হয়ে গেছে মূর্তিটার। গোড়ায় কী রঙ ছিল বোঝার উপায় নেই। মূর্তির মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ।

এতক্ষণে ঘড়ির দিকে তাকালাম। বেলা প্রায় সাড়ে-চারটে। এখনও ঢের পথ যেতে হবে তাই হারাধনের তাড়ায় মন্দিরকে বাঁয়ে রেখে পাশের খেতের আলপথে নেমে পড়লাম।

অনেকক্ষণ হাঁটার পরেই হারাধনের কথায় চমক ভাঙল। আসলে দেবী ভবানীর নয়, ওই মূর্তির কথাটাই ভাবছিলাম।

হারাধন বলে উঠল, "স্যার, আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো?"

"কেন, চা-ওয়ালা তো এইরকমই বলেছিল," উত্তর দিলাম।

"স্যার, আমার মনে হচ্ছে আমরা রাস্তা গোলমাল করে ফেলেছি," হারাধন বলল।

"সে কী!" বলেই চারপাশে তাকালাম। চোখে পড়ল, খেতের শেষ প্রান্ত থেকে অনুর্বর একটা বিশাল মাঠ শুরু হয়েছে। মাঠের ওপারে কয়েকটা চালাঘর চোখে পড়ছে।

ডবল P মানে ডবল পাওয়ার

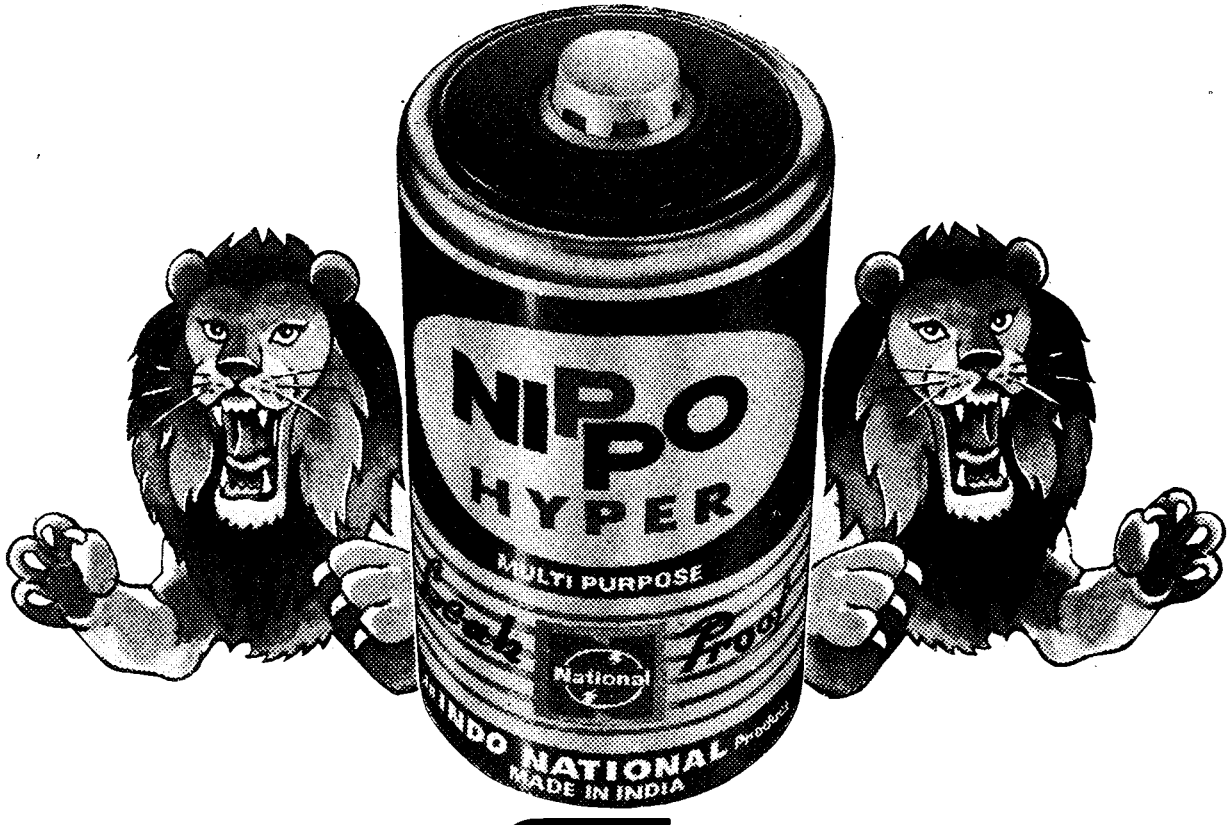

National নিপ্পো

হাইপার ও সুপার

লিক প্রুফ ব্যাটারী

যখন অন্যান্য ব্যাটারী লিক করতে ও শেষ হতে সুরু করে, তখন ধাতব আবরণ যুক্ত নিপ্পো হাইপার ও সুপার বিনা বিরতিতে চালু থাকে। এটা হ'ল ঐ ডবল প্রতিরোধক ব্যবস্থা, যা' এই ব্যাটারীকে দেয় ডবল শক্তি—একটি আঁটসাটো ধাতব জ্যাকেটের ভেতরে একটি মজবুত ভিনাইল টিউব শক্তি প্রবাহকে অবিরাম ও শক্তিশালী করে রাখে।

অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারদের তদারকীতে শ্রেষ্ট মানের কাঁচা উপাদানে নিপ্পো প্রস্তুত করা হয়। গত ১১ বছর ধরে ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় সেরা জিনিসটি এখন তার ১০০ কোটি তম সেল উৎপাদনের উৎসব পালন করছে।

এ ছাড়া রয়েছে অপ্রতিদ্বন্দী বৈশিষ্টগুলি:

- টপ সীল, কারখানা-তাজা শক্তির গ্যারেন্টি দেয়।
- ISI মার্কা—গুণমান সম্পর্কে আপনার ভরসা।
- জাপানের ন্যাশনাল থেকে বিশ্ব-শ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রস্তুত।
- আপনার কাছে পৌঁছবার আগে প্রতিটি ব্যাটারী-ইলেক্ট্রনিক উপায়ে পরীক্ষিত।
- UM-1, UM-2, UM-3—সব ক'টি জনপ্রিয় সাইজে পাওয়া যায়।

everest/d85/INL/60 ben

রোদের তেজও ততক্ষণে কমে এসেছে। ঘড়িতে সাড়ে-পাঁচটা। একটু সন্ধের আমেজও দেখা দিয়েছে।

এই প্রথম একটা দুশ্চিন্তা আমায় চেপে ধরল। কোথাও অবশ্যই একটু ভুল হয়েছে, আমরা নির্ঘাত পথের নিশানায় গোলমাল করে ফেলেছি।

হারাধনকেও ভাবিত মনে হল। ও আমার মুখের দিকে তাকাল।

ঠিক তখনই লুঙ্গি-পরিহিত একজন লোককে মাঠের উপর দিয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম।

মাঝবয়সী একজন লোক।

লোকটা আমাদের কাছে এসে আমার আর হারাধনের আপাদমস্তক দেখে নিল। শহুরে বাবুরা এভাবে বোধহয় এখানে বড় একটা আসে না, তাই লোকটা অবাক হয়েছে মনে হল।

"কোথায় যাবেন, বাবুরা ?" লোকটা প্রশ্ন করল।

"স্টেশনে যাব। সেটা এখান থেকে কতদূর ?" বললাম।

"ইস্টিশান ? সে তো ঢের দূর, তা পাঁচ ক্রোশ পথ হবে।"

পাঁচ ক্রোশ ! মানে কম করেও ছ' মাইল। নির্ঘাত আমরা ভুল পথে চলে এসেছি।

লোকটা এবার বলল, "আজ আর ইস্টিশানে যাওয়া যাবে না, বাবু। আজ আমাদের এখানেই থেকে যান, কাল সকালে যাবেন।"

ততক্ষণে বেশ আলো কমে এসেছে, সন্ধ্যার আর দেরি নেই। কী করা উচিত না ভেবেই লোকটার দিকে তাকালাম।

"এ জায়গাটা তেমন ভাল নয়, বাবু। রাতের বেলা ইস্টিশানে যাবেন না আপনারা," লোকটা বলল।

"কিন্তু এখানে থাকব কোথায় ?" বললাম।

"আমরা গ্রামের মানুষ, তবু দু-একজন মানুষ এলে কষ্ট করেও তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আপনারা আজ রাত্তিরটা এ গ্রামেই থেকে যান, বাবু। কাল সকালে ইস্টিশানে পৌঁছে দেব।"

হারাধনের দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম সেও বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছে। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারও নেমে আসছে, যা হয় এখনই ঠিক না করলেই নয়। অন্ধকারে অচেনা পথে যাওয়াও তো বোকামি।

শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়াই ঠিক করলাম। কী আর এমন কষ্ট হবে, একটা রাত মাত্র।

লোকটাকে সেকথা বলতেই সে বেশ খুশি হয়ে আমাদের ওর সঙ্গে যেতে বলল। আমরাও তাই করলাম।

লোকটা মাঠ পার হয়ে কয়েকটা চালাঘরের কাছে আমাদের নিয়ে এসে তারই একটায় আমাদের ঢুকতে বলল। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একটা ঘর। একটা খাটিয়া রয়েছে ঘরটায়। লোকটা আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কেমন একটা অস্বস্তিই লাগছিল অচেনা এই জায়গাটাতে এসে। আচমকা হারাধন আমার হাত ধরে টানল।

"স্যার, এ জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না। লোকটাও ভাল না। ওকে আর দুজনের সঙ্গে ফিসফিস করে কীসব আলোচনা করতে দেখলাম। স্যার, চলুন, আমরা ও আসার আগেই পালাই।"

"পালাব ?"

"হ্যাঁ, স্যার, আসুন।" বলেই হারাধন আমাকে প্রায় টেনে নিতে চাইল।

কী ভেবে আমিও আর দেরি করলাম না, হারাধনের সঙ্গে বাইরে এসে প্রাণপণে দৌড় শুরু করলাম সেই মাঠের উপর দিয়ে।

বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে ততক্ষণে। তবুও ছুটতে ছুটতে তারই মধ্যে শুনতে পেলাম বহু লোকের চিৎকার, "ধর্···ধর্···পালাল।"

কত বেগে যে ছুটেছিলাম জানি না। তারই মাঝখানে পিছন ফিরে একবার তাকাতেই দেখলাম দশ-বারোজন লোক বড়-বড় লাঠি হাতে আমাদের দিকেই বিপুল বেগে চিৎকার করে ছুটে আসছে। ক্রমেই তারা কাছে এসে পড়ছিল—আমাদের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে।

যে বেগে আমরা ছুটেছিলাম তত বেগে জীবনে কখনও ছুটেছি কি না জানি না। কোথায় ছুটছি তাও জানি না, শুধু জানি আমাদের পালাতে হবে।

ঠিক তখনই মনে হল লোকগুলোর চিৎকার যেন কমে এসেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে একটু দাঁড়িয়ে পিছনে তাকালাম।

একটা অভাবিত দৃশ্য দেখে প্রায় পাথর হয়ে গেলাম হারাধন আর আমি।

বিশাল একটা মূর্তি মাঠের মাঝখানে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। দূরে অস্পষ্ট ছায়ার মতো সেই লোকগুলো ছুটে পালাচ্ছে। তাদের চিৎকারও শুনতে পাচ্ছি "ওই ধরল···পালাও···পালাও।"

ততক্ষণে রাতের অন্ধকার নেমে আসায় সবই অদৃশ্য হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে থেকে। নতুন করে আবার আমরা ছুটে চললাম সামনের দিকে।

বেশ খানিকটা ছুটে চলার পর দূরে চোখে পড়ল মিটমিট করে জ্বলছে কিছু আলো। নিশ্চয়ই কোনও গ্রামই হবে।

আচমকা তখনই হ্যারিকেন ঝুলিয়ে একজন সাইকেল-আরোহী আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

লোকটা আমাদের দেখে বলল, "কে আপনারা ? কোথায় যাবেন ?"

আমাদের তখন প্রায় ভেঙে পড়ারই অবস্থা। কোনওরকমে হাঁফাতে হাঁফাতে সব ঘটনা বললাম লোকটাকে। ওই মূর্তির কথাটাও বাদ দিলাম না।

লোকটা সব শুনে বলল, "আপনারা ভাগ্যের জোরেই বেঁচে এসেছেন। লোকগুলো ডাকাত। মা-ভবানীই আপনাদের রক্ষা করেছেন। ভয় নেই, আমি এখানকার অঞ্চল-প্রধান। আজকের মতো এখানেই থাকবেন চলুন, কোনওরকম অসুবিধা হবে না।"

আমাদের আর চলার অবস্থা ছিল না, টলতে-টলতে তাই লোকটাকে অনুসরণ করলাম।

পরে সুস্থ হয়ে শুধু একটা কথাই ভাবছিলাম—ওই মূর্তিটা কার ? দেবী ভবানীর মন্দিরে সেই প্রহরীর ? আমি জানি হারাধনের মনেও একই কথা তোলপাড় হয়ে চলেছিল।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব ছৈ ছৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

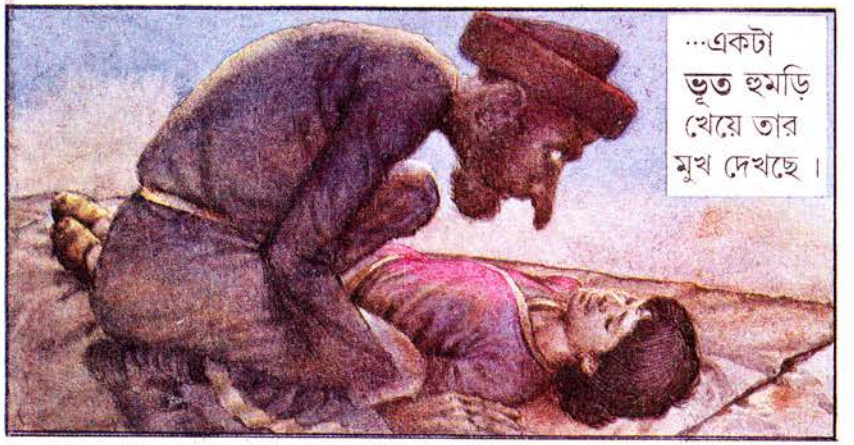

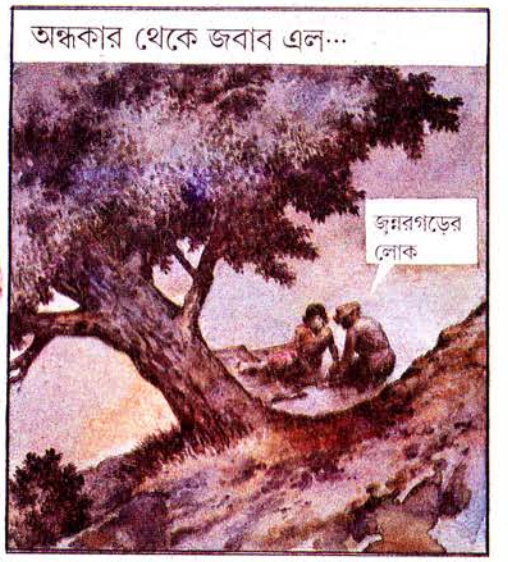

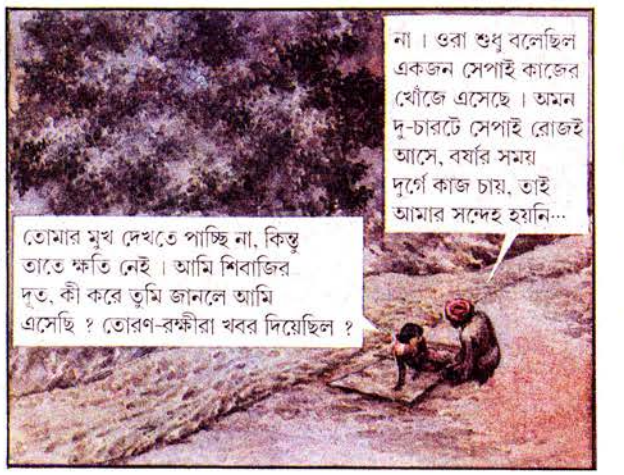

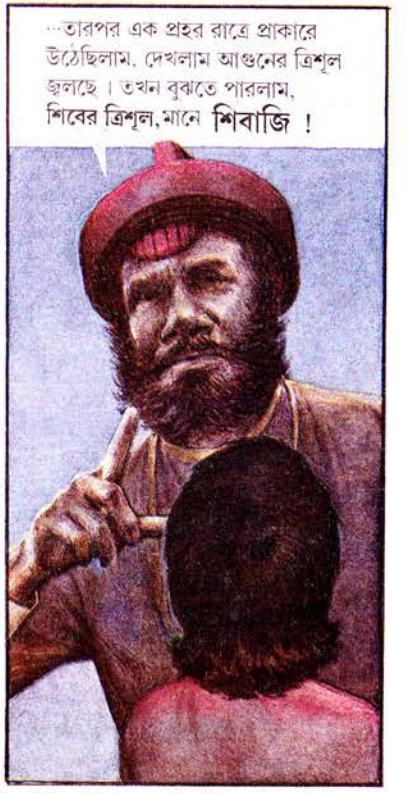

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ছবি এঁকেছে **পিনাকী ঘোষ** (বয়স ১১)

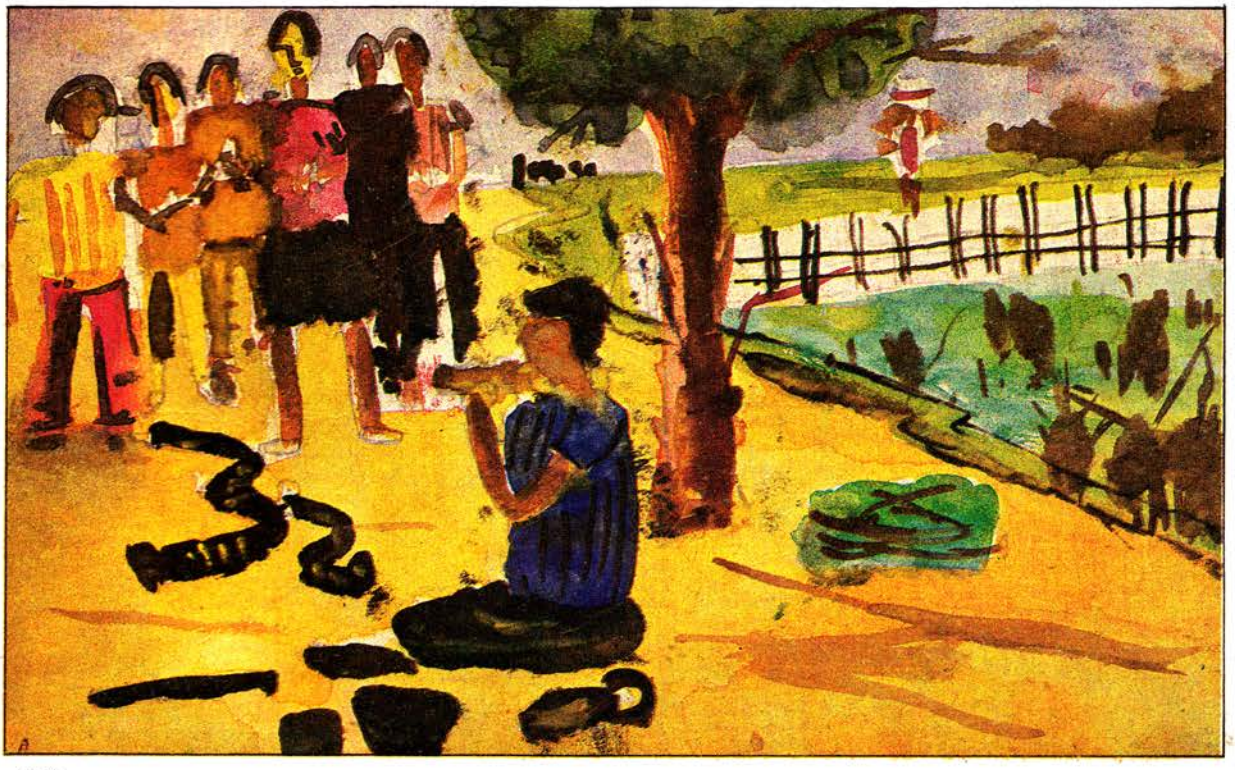

ছবি এঁকেছে **সোমরাজ দত্ত** (বয়স ৭)

মেঘলা দিনে

মেঘলা দিনে একলা বসে
ভাবছি কত কী—
বড় হব মানুষ হব
হব যে বিজ্ঞানী ;
পাড়ি দেব দূর বিদেশে
শিখতে কত কী।

সুমিতা বর্মন (বয়স ১৫)

ছবি এঁকেছে **রাজর্ষি চক্রবর্তী** (বয়স ৬)

কবির ভাবনা

এক কবি ছড়া লিখতে বসেছেন। প্রথম এক লাইন ঝটপট মাথায় এসে গেল। 'গরমের দুপুরে'– তারপর আর মাথায় আসে না।

কবি ভেবেই চললেন। ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কবির ছড়ার লাইন মাথায় এসে গেল। তিনি বাড়ি এসে লিখলেন

'গরমের দুপুরে
জল নেই পুকুরে।'

সৌমক বেরা (বয়স ৯)

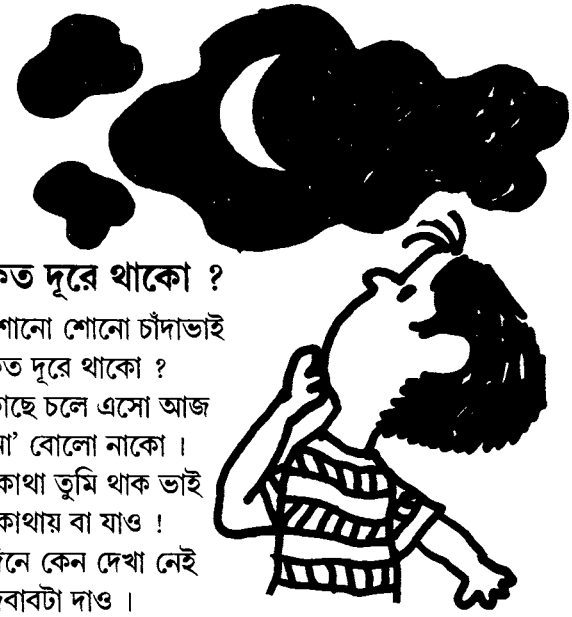

কত দূরে থাকো ?

শোনো শোনো চাঁদাভাই
কত দূরে থাকো ?
কাছে চলে এসো আজ
'না' বোলো নাকো।
কোথা তুমি থাক ভাই
কোথায় বা যাও !
দিনে কেন দেখা নেই
জবাবটা দাও।

বিশ্বরঞ্জন দাস (বয়স ১২)

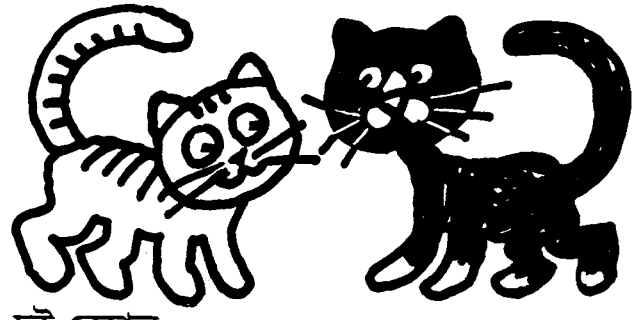

দুই বেড়াল

আমাদের বাড়িতে দুটো বেড়াল আছে। সাদাটার নাম পুষি, কালোটার নাম কালি। পুষিকে সবাই ভালবাসে। কালিকে কেউ ভালবাসে না। বাবা-মা পুষিকে দুধ-মাছ-ভাত খেতে দেয়, কোলে তুলে আদর করে।

কালিকে এমন করে কেউ ভালবাসে না, খেতেও দেয় না। কালি মিউ-মিউ করে ডাকে, আর ছাইগাদায় শুয়ে থাকে।

একদিন রাতে দুপ্‌দাপ্ শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোর নাকি ? শব্দ শুনে বাবাও উঠে পড়েছেন। দেখলাম একটা ইঁদুর কালির মুখে। আমাদের দেখে কালি ভয়ে পিট-পিট করে তাকাচ্ছে। ওদিকে পুষি বিছানায় আরামে ঘুমোচ্ছে।

আমাদের ঘরে অনেক ইঁদুর আছে। বহুদিন ধরেই ইঁদুর ঘরের আসবাব জিনিসপত্র নষ্ট করে। কালির ইঁদুর ধরা দেখে সবাই খুশি। পরেরদিন থেকে কালির খুব আদর বেড়ে গেল।

জ্যোতির্ময়লাল মাইতি (বয়স ৬)

বুটিদার ফেট্টি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মায়ের মৃত্যুর পর হেলেন স্টোনার ও তার বোন জুলিয়ার অভিভাবক হন তাদের বদমেজাজি বিপিতা। মায়ের উইলে তাঁর টাকাকড়ি দুই বোনকে ও তাদের বিপিতাকে দেওয়া হয়েছে। জুলিয়ার বিয়ে হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই সে মারা যায়। তারও আগে পরপর কয়েক রাত্রিতে সে শিসের শব্দ শুনেছিল। তার মৃত্যুকালীন উক্তি : বুটিদার ফেট্টি। কাছাকাছি কিছু বেদে রয়েছে, মাথায় তারা বুটিদার রুমাল বাঁধে। জুলিয়া কি তাদের কথাই বোঝাতে চেয়েছিল ? হেলেনও সম্প্রতি শিসের শব্দ শুনেছে। ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে শার্লক হোমসের কাছে। হেলেন চলে যাবার পরে আসেন তার বিপিতা। হোম্‌সকে তিনি ভয় দেখান। খোঁজ নিয়ে হোম্‌স জানতে পারে যে, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে বিপিতা আর্থিক অসুবিধায় পড়বেন। হোম্‌স অতঃপর হেলেনদের বাড়িতে এসেছে। ঘরের ঘুলঘুলি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেইসঙ্গে বিপিতার ঘরের লোহার সিন্দুকের উপর একটা ডিশ। তাতে রয়েছে খানিকটা দুধ। তারপর···

হোমস কাঠের চেয়ারটার সামনে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর চেয়ারের বসার জায়গাটা আতশকাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। "যাক্, ব্যাপারটার কিনারা হয়ে গেল," আতশকাঁচটা পকেটে পুরতে পুরতে হোমস বলে উঠল, "আরে, এটা আবার এখানে কেন ?" যে-জিনিসটার ওপর হোমসের নজর পড়েছিল, সেটা আর কিছু নয়, কুকুরের গলার বকলসের সঙ্গে একটা দড়ি। দড়িটা খাটের একধারে ঝোলানো ছিল। দড়িটার একটা মুখ পাকিয়ে ফাঁসের মতো করা। প্রয়োজনে এটা চাবুক হিসেবে ব্যবহার করা চলবে।

"ওয়াটসন, এটা দেখে কী মনে হচ্ছে ?"

"এটা যে কুকুরের গলায় আটকাবার একটা সাধারণ দড়ি সেটা বুঝেছি, কিন্তু এখানে এটা এভাবে রাখার কী মানে সেটা মাথায় ঢুকছে না।"

"বলেছ ঠিকই, জিনিসটা এখানে বেমানান।···ওহ্, দেশটা বজ্জাতিতে ভরে গেছে। যখন বুদ্ধিমান লোক শয়তানির পথ ধরে, তখনই হয় মুশকিল। আমার যা দেখবার দেখা হয়ে গেছে। চলুন মিস স্টোনার, আমরা এখন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কথাবার্তা বলি।"

আমি এর আগে কখনও কোনও অবস্থায় হোমসকে এত গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। তার চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলুম, কোনও বিশেষ কারণে সে খুব বিচলিত আর চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হোমস কোনও কথা না বলে বাগানের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল। হোমসের গম্ভীর মুখ দেখে আমরা কেউ কোনও কথা বলতে সাহস করিনি।

হঠাৎ এক সময় নিস্তব্ধতা ভেঙে হোমস বললে, "মিস স্টোনার, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আপনাকে আমার পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে।"

"আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

"অত্যন্ত মারাত্মক পরিস্থিতি। একটু দোনামনা করলে ভীষণ বিপদ হবে। আমার পরামর্শ শোনা বা না-শোনার ওপর আপনার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।"

"আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার সব কথা আমি শুনব।"

"প্রথম কথা হচ্ছে আজ রাত্রে আমি আর আমার বন্ধু আপনার ঘরে থাকব।"

আমি আর মিস স্টোনার অবাক হয়ে হোমসের দিকে তাকাতে হোমস বললে, "হ্যাঁ, এ ব্যবস্থাটা করতেই হবে। বলছি শুনুন। এখানে নিশ্চয় রাত কাটাবার মতো হোটেল আছে ?"

"হ্যাঁ, ক্রাউন ইন বলে একটা আস্তানা আছে।"

"খুব ভাল। সেখান থেকে কি আপনার ঘরটা দেখা যায় ?"

"হ্যাঁ, দেখা যায়।"

"বেশ। এবার ভাল করে শুনুন। আপনার বিপিতা ফিরে আসা মাত্রই আপনি মাথা ধরার ছুতো করে আপনার ঘরে খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়বেন। তারপর যখন বুঝবেন যে, আপনার বিপিতা শুয়ে পড়েছেন, তখন খুব সাবধানে আপনার ঘরের বাগানের দিকে জানালাটা খুলে সেখানে একটা মোমবাতি জ্বেলে বসিয়ে দিয়ে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আপনার নিজের ঘরে চলে যাবেন। সে-ঘরে মিস্ত্রির কাজ চলছে বলে আপনার শুতে হয়তো একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু এক রাত্তিরের জন্যে সে-অসুবিধে মেনে নিতেই হবে। তবে সাবধান, সব ব্যাপারটা চুপিসারে করতে হবে, কেউ যেন টের না পায়।"

"ঠিক আছে। আমার ও-ঘরে শুতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

"ভাল কথা। বাকিটা আপনি আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।"

"আপনারা কী করবেন ?"

"আজ রাতটা আপনার ঘরে থেকে, যে-শব্দের জন্যে আপনার ঘুম হয়নি তার কারণটা খুঁজে বের করব।"

হোমসের কোটের হাতাটা চেপে ধরে মিস স্টোনার বললেন, "মিঃ হোমস, আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন কিছু আঁচ করেছেন ?"

"হয়তো করেছি।"

"তা হলে দয়া করে আমার বোনের মৃত্যুর কারণটা আমায় বলুন।"

"দেখুন, সব কথা খুলে বলবার আগে আমার আরও প্রমাণ চাই।"

"অন্তত এটুকু বলুন যে, তার মৃত্যুর সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছি সেটা ঠিক কি না। জুলিয়া কি ভয় পেয়েই মারা পড়েনি ?"

"আমি তা মনে করি না। আপনার বোন নিছক ভয় পেয়েই মারা পড়েন নি। তাঁর মৃত্যুর পিছনে বাস্তব কারণ ছিল।···মিস স্টোনার, এখন আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব। ডঃ রয়লট যদি হঠাৎ এসে পড়ে দেখেন যে, আমরা আপনার সঙ্গে

কথা বলছি, তা হলে যে-জন্যে আমাদের আসা সেটাই ব্যর্থ হবে। এখন চলি। মনে ভরসা রাখুন। যে-রকম বললুম, সেই মতো কাজ করলে আপনার সব বিপদ কেটে যাবে।"

মিস স্টোনারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সোজা এলুম ক্রাউন ইন-এ। সেখানে রাত কাটাবার উপযুক্ত একটা ঘর পাওয়া গেল। আমরা দোতলার ঘর নিলুম। আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে মিস স্টোনারদের বাড়িটা পরিষ্কার দেখা যায়। সন্ধের একটু পরে দেখলুম যে, ডঃ গ্রিমসবি রয়লট একটা গাড়ি করে বাড়ি ফিরছেন। তাঁর দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার পাশে পুঁচকে কোচোয়ান ছোকরাকে বামনের মতো মনে হচ্ছিল। বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কোচোয়ান ছেলেটা লোহার গেট খুলতে গেল। বেচারা বোধহয় ভারী গেটটা খুলতে পারছিল না। আমরা দেখলুম ডাক্তার চিৎকার করে ছেলেটাকে কীসব বলছে আর ঘুসি পাকিয়ে শাসাচ্ছে। একটু পরেই গাড়িটা গেটের ভেতরে ঢুকে গেল। আর তার অল্পক্ষণ পরেই একটা ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

আমরা ঘর অন্ধকার করে বসে ছিলুম। "ওয়াটসন, আজ রাত্তিরে তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। বিপদের ঝুঁকি বড় বেশি।"

"আমি কি তোমাকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারব ?"

"তুমি থাকলে আমার খুব সুবিধে হবে।"

"তা হলে আমি অবশ্যই যাব।"

"আমি জানতুম।"

"হোমস, তুমি বারবার বিপদের কথা বলছ। বুঝতে পারছি ওখানে তুমি এমন-কিছু দেখেছ যা নিশ্চয়ই আমার নজর এড়িয়ে গেছে। একটু বুঝিয়ে দেবে ?"

"না, ঠিক তা নয়। আমার ধারণা, আমি কিছু-কিছু সঠিক সিদ্ধান্ত করতে পেরেছি। তুমি যা দেখেছ আমিও তা-ই দেখেছি।"

"সত্যি কথা বলতে কী, আমি কিন্তু ওই ঘণ্টা-টানা দড়িটা ছাড়া বিশেষ করে চোখে পড়বার মতো আর-কিছু দেখতে পাইনি। তবে কী উদ্দেশ্যে ওই দড়িটা ওই জায়গায় ঝোলানো আছে তা বুঝতে পারিনি।"

"ওই ঘুলঘুলিটা তোমার নজরে পড়েনি ?"

"হ্যাঁ, তবে দুটো ঘরের মধ্যে ঘুলঘুলি থাকাটা এমন কী আশ্চর্যের ব্যাপার তা আমার মাথায় ঢুকছে না। আর ঘুলঘুলিটা এতই ছোট যে, ওর মধ্যে দিয়ে একটা বড় ইঁদুরও গলতে পারবে না।"

"ওয়াটসন, স্টোক মোরানে আসবার আগে থেকেই আমি জানতুম যে, ওখানে ওই ঘুলঘুলিটা আছে।"

"হোমস !!!"

"জানতুম বই কী ! তোমার মনে আছে বোধহয় যে, মিস স্টোনার বলেছিলেন তাঁর বোন প্রায়ই রয়লটের কড়া তামাকের গন্ধ পেতেন। এর থেকে তো বোঝা যায় যে, দুটো ঘরের মধ্যে অন্তত পক্ষে একটা হাওয়া চলাচলের মতো রন্ধ্র আছে। আর এই পথটা নিশ্চয়ই খুবই ছোট। না হলে এটা করোনার ভদ্রলোকের চোখে পড়ত। তাই একটা ঘুলঘুলি থাকবে বলেই আমি সিদ্ধান্ত করেছিলুম।"

"কিন্তু একটা ছোট ঘুলঘুলি থাকাটা দোষের কী হল !"

"ঘটনাগুলো পর পর যেমন-যেমন ঘটেছে, সেই তারিখগুলো মিলিয়ে দেখলে একটা অদ্ভুত-কোইনসিডেন্স—মানে ঘটনার সন্নিপাত—নজরে পড়ে। একটা ঘুলঘুলি করানো হল, সেখান থেকে একটা দড়ি ঝোলানো হল, আর সেই ঘরে যে ভদ্রমহিলা শুতেন তিনি মারা গেলেন।"

"দ্যাখো,তুমি যে যোগাযোগের কথা বলছ, সেটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।"

"তুমি কি বিছানাটা ভাল করে লক্ষ করেছিলে ?"

"না।"

"খাটটা ঘরের মেজের সঙ্গে একেবারে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। তুমি কি কখনও মেজের সঙ্গে আটকানো খাট দেখেছ ?"

"তা দেখিনি।"

"মানে ভদ্রমহিলার পক্ষে খাটটাকে ওই ঘরের অন্য কোনও জায়গায় সরিয়ে নেবার উপায় ছিল না। ঘুলঘুলি দড়ি আর খাট সব সময়ে একই জায়গায় একই অবস্থায় থাকতেই হবে। এখন অবশ্য ওটাকে দড়ি বলতে দোষ নেই। কেননা ওটার সঙ্গে কোনও ঘণ্টার যোগ নেই তা আমরা জেনে গেছি।"

"হোমস," আমি চিৎকার করে উঠলুম, "তুমি কী বলতে চাইছ তা খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। খুব সূক্ষ্ম অথচ খুব জঘন্য ধরনের ক্রাইমকে আমরা হয়তো ঠেকাতে পারব।"

"হ্যাঁ, খুব সূক্ষ্ম আর খুবই জঘন্য। যখন কোনও ডাক্তার পাপের পথে যায় তখন সে সবচেয়ে খারাপ ধরনের ক্রিমিন্যাল হয়। পামার আর পিচাডের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। এ কিন্তু আরও বুদ্ধিমান। তবে আমার বিশ্বাস, আমরা ওর চাইতেও ঘড়েল। যাই হোক, আজ রাত্তিরে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই এসো, চুপচাপ বসে পাইপ খেতে খেতে সৎ চিন্তা করে মনটা প্রফুল্ল করা যাক।"

গাছের সারির ফাঁক দিয়ে নজর রাখতে রাখতে রাত ন'টা নাগাদ দেখলুম যে, মিস স্টোনারদের ঘরের আলোগুলো এক-এক করে নিবে গেল। চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল। এর প্রায় দু' ঘণ্টা পরে ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল, তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

বড়িশা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

"আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ, ১৯২০ সালের জুলাই হইতে ১৯৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত এই এগারো বৎসর আমি সাধ্যমতো বড়িশা স্কুলের সেবা করিয়াছিলাম। বড়িশা স্কুলই আমার কলিকাতা নগরীর প্রবেশদ্বার। আমি থাকিতাম ভবানীপুরে, সেখান হইতে বড়িশা যাওয়ার ক্লেশ যে কতটা ছিল তাহা এখনকার যুবকরা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। এত ক্লেশ সত্ত্বেও আমি অন্যত্র শিক্ষকতার জন্য চেষ্টা করি নাই। ...আমার অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ বড়িশায় শিক্ষকতা কালে লিখিত। বড়িশার শিক্ষক জীবনকেই আমার কাব্যজীবন বলিতে পারি।... বড়িশা স্কুলে থাকিতেই আমি পাঠ্যপুস্তক রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলাম। সেই পাঠ্যপুস্তকই আমাকে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।" এইভাবে একটি প্রবন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁর শিক্ষকজীবনের স্মৃচিচারণ করে সবশেষে লিখেছেন, "একদিন যে বিদ্যাপীঠ আমায় সুদূর উত্তরবঙ্গ হইতে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার উদ্দেশে আমি শত সহস্র প্রণাম জানাই।"

বড়িশা হাইস্কুল—কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির এই পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুলটির জন্ম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে, ১৮৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগ্রহে ও সহায়তায় 'বড়িশা দেশ হিতৈষিণী সভা'র সদস্য সূর্যকুমার রায়চৌধুরী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম অবস্থায় স্কুলের নিজস্ব কোনও বাড়ি ছিল না, ক্লাস হত বড়িশা গ্রামের জমিদারবাড়ির 'সাজের আটচালা'য়। কিন্তু এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাকে কিছু লোক ভাল চোখে দেখেনি, ইংরেজি শিক্ষা 'জাতি ধর্ম নাশকারী'—এই দোহাই দিয়ে তাঁরা হৈচৈ ফেলে দিলেন। এঁদের দলাদলির ফলেই স্কুলটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় তারাকুমার রায়চৌধুরীর বাগানবাড়িতে। পরে অবশ্য এই গোলমাল মিটে যায় এবং ১৮৬০ সালে স্কুলের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্রসংখ্যা ছিল নগণ্য, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারদিকে স্কুলটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেই খ্যাতি আজও অব্যাহত আছে। প্রথম প্রধানশিক্ষক ছিলেন জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

বড়িশা হাইস্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০০। লেখাপড়ায় এই স্কুলের বিশেষ সুনাম আছে। পরীক্ষার ফলাফলও ভাল হয়। জাতীয় মেধাবৃত্তি প্রতি বছরই থাকে। ১৯৭৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে এই স্কুলের ছাত্র অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় প্রথম হয়েছিলেন। খেলাধুলোতেও বড়িশা হাইস্কুলের ছাত্ররা নানা কৃতিত্ব

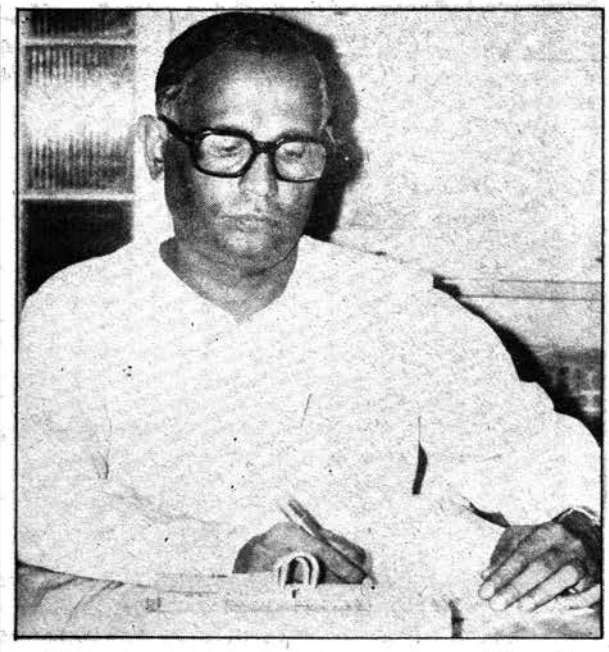

দেখিয়েছেন। ১৯৮২ সালে এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১৬৩জন। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ৩১জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৬, তৃতীয় বিভাগে ৬৬। ১৯৮৩ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ১৫৫। প্রথম ১৮, দ্বিতীয় ৭২, তৃতীয় ৬৫। ১৯৮৪ সালে পরীক্ষার ফলাফল এইরকম : পরীক্ষার্থী ১৫৭। প্রথম ২৫, দ্বিতীয় ৭৮, তৃতীয় ৫৪। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক।

বড়িশা হাইস্কুলের বর্তমান প্রধানশিক্ষক শ্রীবিনয়ভূষণ আইচ। তিনি শিক্ষকতা করছেন ১৯৬০ সাল থেকে, এই স্কুলে আছেন ১৯৬৭ থেকে। শ্রী আইচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম. এ.। ইতিহাস তাঁর বিষয় হলেও তিনি ক্লাসে প্রধানত ইংরেজি পড়ান। পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য তাঁর বক্তব্য জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন,"পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য ভালভাবে পড়াশুনো করতে হবে, এ-কথা কে না জানে। কিন্তু পড়াশুনো করলেই তো আর হয় না, আমি কী পড়েছি, কতটা পড়েছি, আমি যা পড়লাম তা সত্যিই আমার মগজে ঢুকেছে কি না এগুলোও জানা দরকার। কীভাবে জানব ? তার তো উপায় একটাই। লিখতে হবে, নিয়মিত লেখার চর্চা করতে হবে। যা-ই লেখা হোক, তা ভুল ঠিক যা-ই হোক না কেন, স্কুলের মাস্টারমশাই বা বাড়ির মাস্টারমশাইদের দেখিয়ে সংশোধন করে নিতে হবে। পড়তেও হবে যেমন, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতেও হবে। আর একটা কথা, ক্লাসের বইয়ের সঙ্গে বাইরের বই পত্রপত্রিকাও পড়তে হবে।"

ইংরেজির প্রসঙ্গ তুলতেই প্রধানশিক্ষক জানালেন, "দেখুন, এখন ইংরেজিতে যা প্রশ্নের ধারা, পাঠ্যবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না পড়লে উপায় নেই। কারণ, অধিকাংশ প্রশ্নই অবজেকটিভ টাইপের, পুরো বই ভালভাবে পড়া না থাকলে মুশকিলে

পড়তে হবে। শুধু পড়লেই হবে না, বুঝে পড়তে হবে। টেস্টপেপারের প্রশ্নগুলো দেখে তার উত্তর করতে হবে, এগুলোর বাইরেও যদি কোনও প্রশ্ন হতে পারে মনে হয়, সেগুলো মাথা খাটিয়ে লিখে ফেলতে হবে। আর একটা ব্যাপার, গ্রামারের উপর সব সময়ই জোর দেওয়া দরকার। গ্রামার জানতে হবে খুব ভাল করে। বিস্তর ছেলেমেয়ে এখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়। এই পরীক্ষায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে, যেগুলোর উত্তর গ্রামার না জানলে দেওয়া সম্ভবই নয়।" প্রধানশিক্ষক একটু ক্ষোভের সুরে বললেন, "ইংরেজির মতো একটি সমৃদ্ধ ভাষাকে কোনওভাবেই হেলাফেলা করে পড়া উচিত নয়। এখনকার বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই ইংরেজি পড়ে নম্বর তোলার জন্য, ক'জন ভালবেসে পড়ে ? এটা সত্যিই খুব পরিতাপের ব্যাপার।"

নোটবই সম্পর্কে প্রধানশিক্ষকের মনোভাব বেশ কঠোর। তিনি বললেন, "নোটবই বইবাজার থেকে একেবারে তুলে দেওয়া উচিত। এইসব অপাঠ্য বই ছেলেমেয়েদের যতটা না উপকার করে, তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি করে।"

ইংরেজি সম্পর্কে পড়ুয়াদের উদ্দেশে তিনি অনেক কথা বললেন। দরকারি কয়েকটি কথা হল : **(ক) সহজ ইংরেজিতে লেখা ভাল বই পড়তে হবে। (খ) কম জানায় কোনও দোষ নেই, কিন্তু ভুল জানা কোনও কাজের কথা নয়। মনে রাখতে হবে, ইংরেজি বাংলা যে-ভাষাই হোক, যেটুকু জানব, সঠিকভাবে জানব। (গ) হাতের লেখা হবে ঝকঝকে। অতি বুদ্ধিমান পড়ুয়াও বানান ভুল করে। এ-ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।**

বাংলা বিষয়ে কথা বলতে গিয়েই শ্রীআইচ একটি ক্ষোভের কথা জানালেন। "সংস্কৃত তুলে দিয়ে আমাদের বেশ ক্ষতি হয়েছে। বাংলার নিজস্ব কোনও ব্যাকরণ নেই, অন্তত এই ব্যাপারে এখনও আমাদের সংস্কৃতের কাছে হাত পাততে হয়। মাতৃভাষায় ভাল দখল থাকলে, অন্য ভাষা আয়ত্ত করতে সময় লাগে না। এই বিষয়টিকে, অনেকেই ভাবে খুব সহজ, সে-রকম গুরুত্ব দেয় না। এর পরিণামও যে ভাল হয় না, বলাই বাহুল্য।"

ইতিহাস বিষয়টি সম্পর্কে প্রধানশিক্ষকের বক্তব্য : "ইতিহাস পড়তে গেলে প্রথমেই সময়-সচেতন হতে হবে। আমি কী পড়ছি, কোন্ সময়ের ঘটনা পড়ছি, এ-ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। মানচিত্র দেখে ইতিহাস পড়তে পারলে ভাল হয়। ইতিহাসে বেশি কিংবা হাবিজাবি লেখার কোনও সুযোগ নেই। অনেক বড় ঘটনাকেও কম কথায় লেখা যায়, কম অথচ ঠিকভাবে লিখতে পারলে ইতিহাসেও অঙ্কের মতো নম্বর উঠবে।"

ভূগোলের শিক্ষক শ্রীসমীরকুমার মজুমদার তাঁর বিষয় সম্পর্কে বললেন, "ভূগোলে একটি বই নয়, একাধিক বই পড়তে হবে। কোনও একটি নির্দিষ্ট বই পড়ে ভাল ফল আশা করা যায় না। পড়বার সময় মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে।"

বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বিষয় সম্পর্কে বললেন, "বিজ্ঞান মুখস্থ করে লাভ হয় না। মুখস্থ না করে, বুঝে পড়তে হবে। বিজ্ঞান পড়াবার সময় ছবি, চার্ট, মডেল ইত্যাদির সাহায্যে পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলতে হবে। মাস্টারমশাইদেরও জটিল বিষয়কে সহজ, সরল করে বলতে হবে, বিজ্ঞান যে নীরস বিষয় নয়, জ্ঞান ও আনন্দের অজস্র উপকরণ এখানে ছড়িয়ে আছে, এটা তাদের কাছে বলার গুণে যেন সজীব হয়ে ওঠে।"

অঙ্কের শিক্ষক শ্রীসুবীর সিংহের বক্তব্য : "অঙ্কে অনুশীলন ছাড়া ভাল নম্বর তোলার অন্য কোনও রাস্তা নেই। মুখস্থ নয়, ফাঁকি নয়, অবহেলা নয়, নিয়মিত অভ্যাসই অঙ্কে পটুতা এনে দেয়।"

সবশেষে প্রধানশিক্ষক 'আনন্দমেলা' কাগজটি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানালেন। কাজের চাপে, সময়ের অভাবে নিয়মিত আনন্দমেলা না-পড়লেও এই কাগজটি যে ছোট-বড় সকলেরই প্রিয় কাগজ, এ-বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই।

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

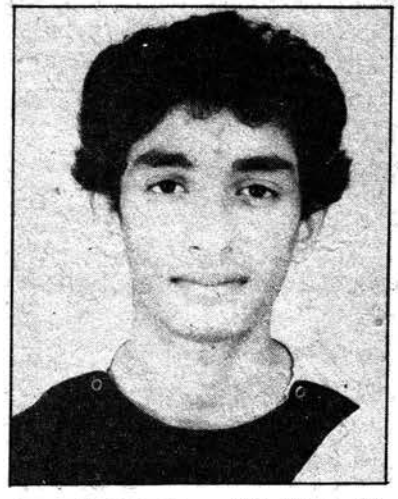

বড়িশা হাইস্কুলে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে ভিক্টর চট্টোপাধ্যায়। বার্ষিক পরীক্ষায়, মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে ভিক্টর পেয়েছে ৭১৪। গোড়া থেকেই এই স্কুলে পড়ছে ভিক্টর, ফার্স্ট ছাড়া কখনও সেকেণ্ড হয়নি। ক্লাসে তার দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, একজন অর্ণব সেনগুপ্ত, অন্যজন সুমিত দাশগুপ্ত।

রোজ সাত-আট ঘন্টা পড়ে ভিক্টর। ছুটির দিনে আর-একটু বেশি। গৃহশিক্ষক আছেন একজন।তিনি বিজ্ঞান দেখিয়ে দেন। দাদু দেখিয়ে দেন সাহিত্য, ভিক্টরের প্রিয় বিষয় ঃ 'বলবিদ্যা'। ভিক্টর নোটবই পড়ে না। নোটবইয়ের কথা তুলতেই ও বলল, : "টেক্সটবই আমি ভালভাবে পড়ি, নোটবই কেন পড়ব ? নোটবইগুলোয় এত ভুলভাল কথা থাকে যে, বলার নয়।"

দাবা খেলতে খুব ভালবাসে ভিক্টর। কিন্তু দাবাড়ু হওয়ার কোনও ইচ্ছে ওর নেই। ওর প্রিয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভবিষ্যতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় ভিক্টর। ওর বাবা শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মা শ্রীমতী পারুল চট্টোপাধ্যায় সর্বদা ছেলের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেন। ছেলে যাতে বড় হয়, প্রতিষ্ঠালাভ করে, সেজন্য তাঁদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই।

'আনন্দমেলা' ভিক্টরের প্রিয় পত্রিকা, তার চেয়েও বেশি প্রিয় 'লেখাপড়া বিভাগ', 'আনন্দমেলা' সম্পর্কে এই হল ওর অভিমত।

দাদুর একুশবারের জন্মদিনে

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদুর কাছ থেকে তাঁর ছ'টি নাতি-নাতনি, গোরা আবীর ঝিলিক বুবাই বিবি আর কঙ্কণা একটি করে রঙিন কার্ড পেল সকালবেলায়।

প্রিয় দাদুভাই/দিদিভাই

আজ আমার একবিংশতম মানে একুশবারের জন্মদিন। অর্থাৎ আজ আমি সাবালক হচ্ছি। এই উপলক্ষে তোমাদের এবং তোমাদের বাহাত্তুরে দিদার নিমন্ত্রণ আমার না-গল্পের আসরে।

আজকে যেটা বলব, সেটা গল্প-না,
নয়কো মনের অলস কোনও কল্পনা।
দাম নেব তাই অনেক কিন্তু, অল্প না।

কী দাম দেবে বলো তো?

তোদের তো ভাই অনেক দাঁত আর চুল,
আমার আবার দুটোই অপ্রতুল।

চাঁদা করে দাঁত আর চুল দিয়ে আমার গল্প-না'র দাম দিও। তোমাদের দিদারও তো ও দুটোই বাড়ন্ত। তাই তিনি শুধু ফোকলা দাঁতের হাসি দিয়েই আমাকে সাবালকত্বে বরণ করবেন। ইতি। তোমাদের দাদু

ওরা তো চিঠি পড়ে হতবাক। দাদুর যে আবার জন্মদিন থাকতে পারে, তা ওদের খেয়ালই ছিল না। দাদুর তো মা নেই। আর মা না থাকলে জন্মদিনের পায়েস রান্না করবে কে? অবশ্য দাদু প্রায়ই বলেন, তোদের তো একটা করে মা, তা তোদের ওই মা'গুলোই আমার মা। দাদুর যত সব অদ্ভুত কথা। তা না-হলে বলেন কিনা আজ ওঁর একুশবারের জন্মদিন! বড় নাতি গোরার বয়সই তো একুশের বেশি, তার পরে আবীর, সেও তো সুকান্তর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটা ভাঁজছে নিজের আগামী জন্মদিনে ১৭ই এপ্রিল আবৃত্তি করার জন্য। দাদু যেন কী!

তবু ওরা জানে, দাদুর সবই নতুন কিছু। ওই যে গল্প-না, ওই জিনিসও ওরা কি কম শুনেছে দাদুর কাছে। আজও শোনা যাবে আরেকবার। আর একুশবারের জন্মদিনের ধাঁধাটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে সেই সময় নিশ্চয়ই।

তাই-ই হল। সন্ধেবেলায় দাদুর ঘরে বসে দিদার তৈরি নারকেল-নাড়ু খেতে-খেতে ওরা শুনল দাদুর বৃদ্ধ বয়সে একবিংশ জন্মদিনের কাহিনী।

দাদু বললেন, "সে কী ভাই, এই সোজা কথাটাও মাথায় ঢোকেনি তোমাদের? আজকের তারিখ কত?"

তারিখটা ছিল ১৯৮৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি।

দাদু বললেন, "উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি কি ফি বছর হয়? চার বছরে একবার।"

মেজ নাতনি বিবি বলল, "হ্যাঁ দাদু, লিপইয়ারে।"

দাদু হাসলেন, "তা আমার জন্ম ওই লিপইয়ারেই। ১৯০৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি। তারপর প্রতি চার বছরে একবার

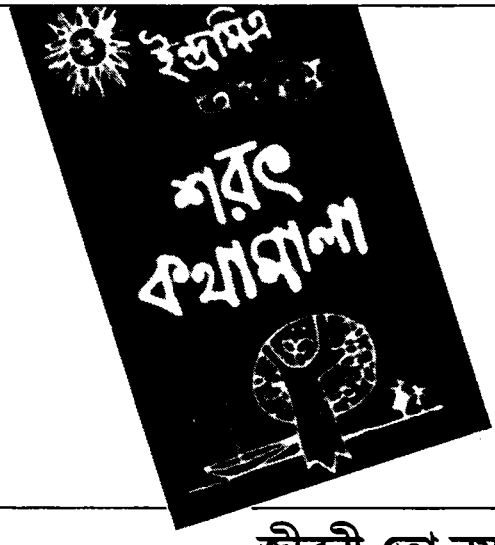

জীবনী তো নয়, যেন মজার গল্পের বই

ইন্দ্রমিত্র এমন এক বিশ্বাসী গবেষক, বইতে দেবার আগে প্রতিটি তথ্যকে যিনি যাচাই করে নেন। তাঁর যে-কোনও লেখাতেই তাই এমন বহু গল্পের মতো ঘটনা থাকে যেগুলি মোটেও গল্পকথা নয়, নির্ভেজাল বাস্তব ঘটনা।

ছোটদের জন্য ইন্দ্রমিত্র- এর দুটি বই। একটিতে তিনি শুনিয়েছেন বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনের কাহিনী, অন্যটিতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তর সরস কহিনী বা খোশগল্প।

বাংলা সাহিত্যের এই দুই দিক্‌পালকে ছোটদের একেবারে কাছের মানুষ করে হাজির করেছেন ইন্দ্রমিত্র। জীবনী পড়ছি কে বলবে, মনে হয় মজাদার গল্পের বই।

ইন্দ্রমিত্রের বই : বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৮·০০, শরৎ কথামালা ১২·০০

বানান শেখার নানান মজা

অনেকে ভাবেন, বাংলা বানানের কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই আর। বানান নাকি সহজ করা হয়েছে। যা-ইচ্ছে লিখলেই হল। অনেকে আবার উল্টোরকম ভাবেন। তাঁদের কাছে বাংলা বানান হল বিভীষিকার এই বিধি, ওই নিয়ম, এই ঝামেলা, ওই ঝঞ্ঝাটে ভর্তি। তোমরা কোন্ দলে ?

যে-দলেই থাকো, কুন্তক-এর 'শব্দ নিয়ে খেলা' আর দেব সেনাপতির 'বানানের ছড়া' বইদুটো সবসময় হাতের কাছে রাখবে। দেখবে, বাংলা বানানের খটমট নিয়মকানুন কেমন খেলাচ্ছলে জানা হয়ে যাচ্ছে। শব্দের গঠনে যে দারুণরকমের মজা রয়েছে লুকনো, তা কেমন সহজে ধরা পড়ছে তোমাদের কাছে। এমন-কি, শক্ত-শক্ত বানান এবং তার নিয়মগুলো কেমন গল্পচ্ছলে গেঁথে গেছে মাথায়। বানান ভুল কী, তাই গেছ ভুলে।

কুন্তক : শব্দ নিয়ে খেলা ১২·০০ **দেব সেনাপতি** : বানানের ছড়া ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯

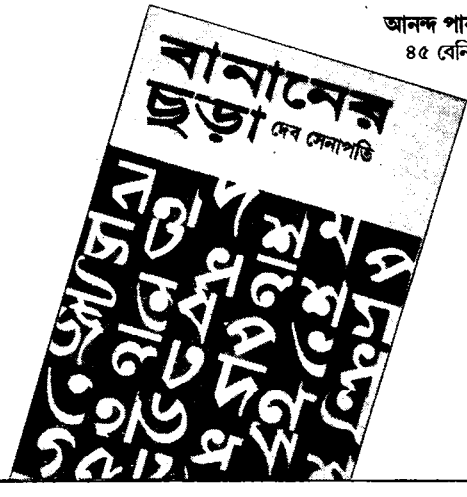

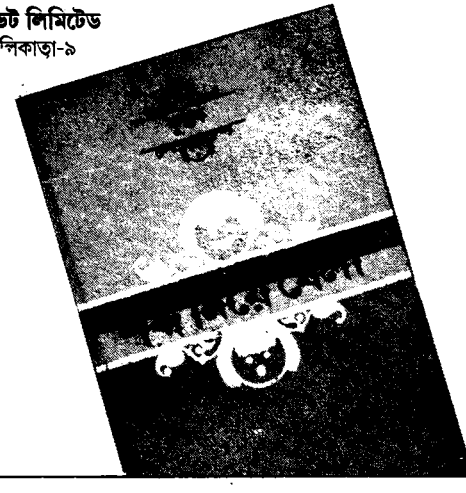

করে আমার জন্মদিন হয়। তা হলে আজ একুশবারের জন্মদিন হচ্ছে না ? দাঁত ভাঙলে কী হয়, টাক মাথায় ক'গাছা সাদা চুল, তাতেই বা কী, আমি ভাই একুশ বছরের যুবক। অঙ্কের হিসেবকে তো উলটে দিতে পারবে না। তোমাদের দিদা কিন্তু বাহাত্তুরে বুড়ি। ওর জন্ম ১৯১২ সালের পয়লা এপ্রিল, আমাকে এপ্রিল ফুল বানাতে।

দিদাও হেসে ফেললেন এবার।

দাদু বললেন, "নারকেল-নাড়ু তো খেলে ভাই, এবার কিন্তু গল্প-না হবে ওই লিপ-ইয়ার নিয়ে।" ছোট নাতনি কঙ্কণার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন ছড়ার সুরে, "কী বলো ভাই কঙ্কণা ?" কঙ্কণা দাদুর ছড়ার দোসর। দু' হাত নেড়ে বলল, "লক্ষ্মী দাদু, যা খুশি হোক, কেবল তোমার অঙ্ক না।"

দাদু বললেন, "অঙ্ক নিয়েই যে আমায় আজকের গল্প-না ভাই। তবে খুব সোজা অঙ্ক। মন দিয়ে শোনো, ভারী ইনটারেস্টিং।"

আমার জন্ম তো লিপ-ইয়ারে। সেই লিপ-ইয়ার হয় কেন, আর কত দিন পরপর, এইটেই আমার আজকের জন্মদিনের আলোচ্য হোক। পৃথিবী সূর্যকে একবার ঘুরে আসে কতটা সময়ে ? তোমরা সবাই জানো, ৩৬৫ দিনে। তাই এই সময়টাকে একক করে ৩৬৫ দিনে এক বছর ধরি আমরা। এটা কিন্তু 'মোটামুটি' সময়। সূর্যকে এক পাক ঘুরে আসতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিনের ওপর আরও ঘণ্টা ছয়েক লেগে যায়। তা এক-একটা বছর তো আর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় করা যায় না। তাতে কত অসুবিধা। ১৯০৪ সালটা শুরু হল রাত বারোটায় তো ১৯০৫ হবে সকাল ছটায়, ১৯০৬ হয়ে যাবে দুপুর বারোটায়, আর ১৯০৭ শুরু হবে ভোর ছটায়, ১৯০৮ সালটা আবার শুরু হবে যথারীতি রাত বারোটায়। এইরকম আবার ভাবা যায় নাকি ? তাই হিসেবের সুবিধের জন্যে প্রতি চার বছরে ছ' ঘণ্টার চারগুণ চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন নিয়ে একদিন করে বাড়িয়ে দেওয়ায় রেওয়াজ হল। ওই বাড়তি দিনওয়ালা বছরটাই লিপ-ইয়ার। কিন্তু দিনটা জোড়া যায় কোন্ মাসে ? সব মাসই তো ৩০/৩১ দিনের বেশ ভরাট মাস। শুধু ফেব্রুয়ারি মাসটাই ছোটখাটো, মাত্র ২৮ দিনের। ওরই সঙ্গে তাই লিপ-ইয়ারে জুড়ে দেওয়া হল একটা দিন। লিপ-ইয়ারের ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল ২৯ দিনের। কিন্তু কোন্ বছরটা লিপ-ইয়ার হবে, তার কী হিসেব ?"

অঙ্কের ভয়ে সদা-কাতর কঙ্কণাই জবাব দেয় এবার সবার আগে, "আরে এ তো সোজা হিসেব। যে বছরের সংখ্যাটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, সেইটাই লিপ-ইয়ার।"

দাদু সগর্বে বললেন, "দেখলি সবাই, অঙ্ক বিষয়টা কত সোজা আর ইনটারেস্টিং। অঙ্কে সব থেকে কমজোর কঙ্কণাদিদিই কেমন চট্‌পট্ জবাব দিচ্ছে।"

কঙ্কণা বলল, "দাদু, ভাল হবে না বলছি।"

দাদুর অঙ্ক তখনও একটু বাকি। সেইটাই এবার শোনালেন দাদু। "হ্যাঁ, ওইগুলোই সাধারণত লিপ-ইয়ার।"

"সাধারণত ?" বুবাই চমকে উঠল, "আবার অন্য লিপ-ইয়ারও আছে নাকি ?"

"না, তা নেই," অভয় দিলেন দাদু, "তবে চার দিয়ে ভাগ দিলেই সব সময় লিপ-ইয়ার হয় না। হয় না প্রতি চারশো বছরে এই রকম তিনবার।"

"কেন দাদু ?" ঝিলিক ভাবল তার একটু ইনটারেস্ট দেখানো দরকার।

"কারণ ওই অঙ্কের 'মোটামুটি'। এক বছরে যেমন মোটামুটি ৩৬৫ দিন, সূক্ষ্ম হিসেবে মোটামুটি ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা, আরও সূক্ষ্ম হিসেবে সেটা ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের মতো। এই যে ৬ ঘণ্টার থেকে প্রায় দশ মিনিটের তফাত প্রতি বছরে, এর ফলে ৪০০ বছরে তিনটে বছরকে লিপ-ইয়ারের মর্যাদা দেওয়া হয় না চার দিয়ে ভাগে মেলার গৌরব সত্ত্বেও। এইগুলো শতাব্দীর শেষ বছর।"

আবীর বলল, "তার মানে ১৭০০ ১৮০০ ১৯০০ ২০০০, এগুলো ?"

"হ্যাঁ, এইগুলোই, তবে দাদুর সৌভাগ্যবশত ২০০০ সালটা লিপ-ইয়ারের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে না।...ছোটবেলায় আমার হাঁচি হলেই মা বলতেন শতং জীব। তা শত বছর বাঁচলে ২০০৪ পর্যন্ত বাঁচতে হয়। তার মধ্যে ২০০০টা যদি লিপ-ইয়ার না হত, তা হলে একে আমি বেচারা চার বছরে একটা জন্মদিন পাই, এ-সময়ে ১৯৯৬-এর পর একেবারে আট বছর পরে শত বছরের শেষ জন্মদিনটা হত। তার জন্যই বোধহয় ২০০০ বছরটাকে লিপ-ইয়ার হতে দেওয়া হয়েছে।"

বড়-বড় চোখে বিবি বলল, "দাদু, সত্যি ?"

"দূর বোকা, সত্যিই তাই হয় নাকি ? ওই যে কথা হল না—৪০০ বছরে তিনটে বছর বাদ, তা শতাব্দীর শেষ বছরগুলোর প্রতি চারটেতে তিনটেকে ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে মেলে না। যেগুলোতে মেলে না, লিপ-ইয়ারের মর্যাদা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে অঙ্কের বিধানে।" বলেই দাদু আবার ছড়া কাটলেন :

"জেনো এটা পৃথিবীর বার্ষিক গতিফল
অঙ্কের বোঝা বাড়ে দিতে তার প্রতিফল।"

এরপরে দাদু শেষ মন্তব্যটি ছাড়লেন, "তবে এর পরেও একটু বাকি।" আর্টস-এর স্টুডেন্ট গোরা। দাদুর এই অঙ্কের কচকচির থেকে দিদার হাতের মোয়া তার অনেক মিষ্টি লাগছিল। সে বলে ফেলল, "এর পরেও বাকি ?"

"হ্যাঁ দাদু, কারণ ওই 'মোটামুটি'। ওই মোটামুটির হিসেব মেলাতে প্রতি পাঁচ হাজার বছরে আবার একটা করে দিন কম বেশি হয়ে যাবে। তা তার তো এখনও অনেক দেরি।"

সভা শেষের আগে দাদু দিদার দিকে চেয়ে বললেন, "দ্যাখো বাপু, আজ কিন্তু আমায় একুশবারের জন্মদিন হয়ে গেল। সাবালক হলাম এবার। আর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে এখন থেকে খবরদারিটা কম কোরো একটু। কই আনো দেখি মস্ত এক বাটি পায়েস। পায়েস ছাড়া কি জন্মদিন জমে ?"

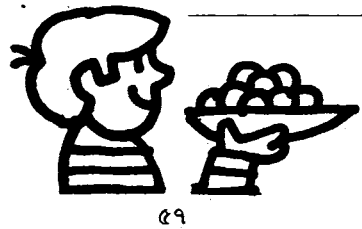

ছবি : দেবাশিস দেব

ধাঁধা

ঠাণ্ডা খাওয়াবার জন্য যে-দোকানটায় নিয়ে গিয়েছিল ছোট্‌কা, তার ভিতরটাও দারুণ ঠাণ্ডা আর বড় বেশি অন্ধকার-অন্ধকার। ফলে, একটু দূরের টেবিলেও যারা বসে আছে, তাদের চেনা যায় না। কিন্তু ছোট্‌কার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। এরই মধ্যে আমার পিছন দিকের টেবিলে-বসা ছ'জনকে ঠিক চিনে ফেলল। আর তাদের নিয়েই বানিয়ে ফেলল দিব্য একটা ধাঁধা।

এই আইটাই গরমে ঠাণ্ডা খাবার নিয়ে বানানো এই ধাঁধাটা শুনতে খারাপ নয়। বেশ জিভে জল-আনা আর তেষ্টা-বাড়ানো। তাই এটা দিয়েই শুরু করি।

প্রথম ধাঁধা ॥ ছ'জন মিলে ঢুকেছে একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকানে। তিনটি ছেলে, তিনটি মেয়ে।

বিরাট টেবিল। এপাশে তিনজন, অন্যপাশে তিনজন বসে পড়ল।

বেয়ারা এল অর্ডার নিতে। ছ'জন দিল ছ'রকম অর্ডার। পল্টু বসেছে মায়ার পাশে।

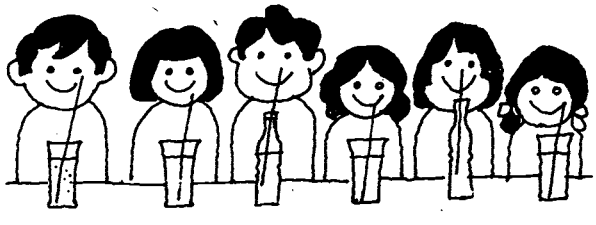

মীরার পাশে বসেছে একটি ছেলে, তার উল্টোদিকে মায়া। তপু নিজের জন্য লস্যি অর্ডার দিল। তপুর মুখোমুখি রত্না, সে তখনও মনঃস্থির করেনি।

ক্রিম-কফির অর্ডার দিল যে-ছেলেটি, সে বসেছে মীরার মুখোমুখি।

আমের শরবত অর্ডার দিল যে-মেয়েটি, সে বসেছে তপু ও শান্তনুর মধ্যখানে।

শান্তনুর বেলের গন্ধ অপছন্দ, কুলপি খেতেও নাকি বরফ-বরফ লাগে।

কুলপি খাবে বলে জানাল একটি মেয়ে, সে বসেছে তপুর ঠিক উল্টোদিকে।

পল্টুর পাশের মেয়ে অর্ডার দিল বেলের শরবতের।

কী, এ-সব শুনে জিভে জল আসছে? এবার তাহলে ঘন-ঘন জলতেষ্টা পাবার মতো প্রশ্নটা বলি। আইসক্রিম অর্ডার দিয়েছিল ছ'জনের একজন। তার নাম কী?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দুই এক মিলে দুই হয়। কখনও-কখনও তার বেশিও হয়। বলতে পারো, দুটো এক কখন দুইয়ের বেশি?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

জদিচটল

গতবারের উত্তর ॥ (১) USHER. এর মধ্যে রয়েছে US, SHE, HE ও HER। (২) ৮৮৮+৮৮+৮+৮+৮=১০০০। (৩) পুরুষসিংহ।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

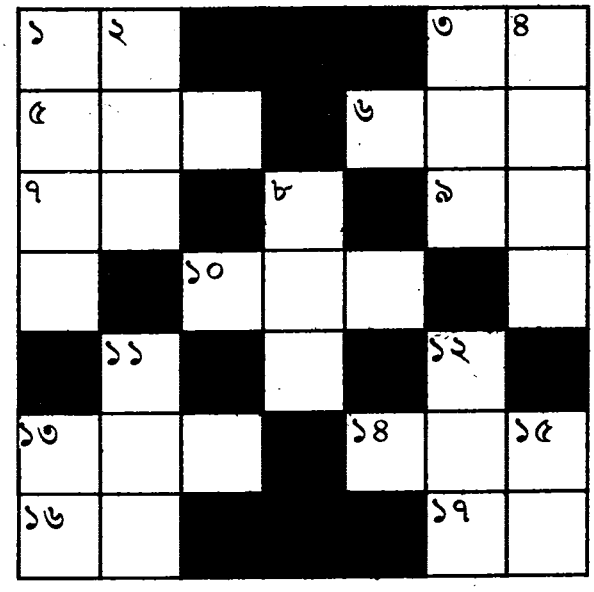

সংকেত : পাশাপাশি : (১) কোন্ ফল উলটে গেলে মজা হয়? (৩) চতুষ্কোণাকৃতি বাজার। (৫) দু' হাতে বাজাতে হয়। (৬) সুগন্ধি কাঠ। (৭) দাম। (৯) উলটে নিলে বিখ্যাত মহিলা জ্যোতির্বিদ। (১০) মুকুল। (১৩) কাঁঠাল। (১৪) রামায়ণের কুখ্যাত চরিত্র। (১৬) কোকিল। (১৭) নির্যাস।

উপর-নীচ : (১) পরশুরাম। (২) দেবালয়। (৩) এক নামে নদী, পাখি আর মাছ। (৪) উত্তরভারতের তীর্থস্থান। (৮) চঞ্চল স্বভাবের ছোট পাখি। (১১) কাঁটা। (১২) ধীর। (১৩) বানর। (১৫) কার্তিকী পূর্ণিমায় এই উৎসব হয়।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বা	তা	সা	■	শা	মি	ল
স	ম	র	■	মা	ত	লা
ব	র	■	■	■	ব	ট
■	স	ও	দা	গ	র	■
কা	■	■	শ	■	■	গো
মি	■	দ্বৈ	র	থ	■	ধূ
নী	প	■	থি	■	ভী	ম

মজার খেলা

প্রথমে নীচের ছবির মতো একটি ছবি এঁকে বন্ধুদের সামনে ধরো। আর সব থেকে ওপরের গোলটার মধ্যে লেখো ৫ সংখ্যাটা।

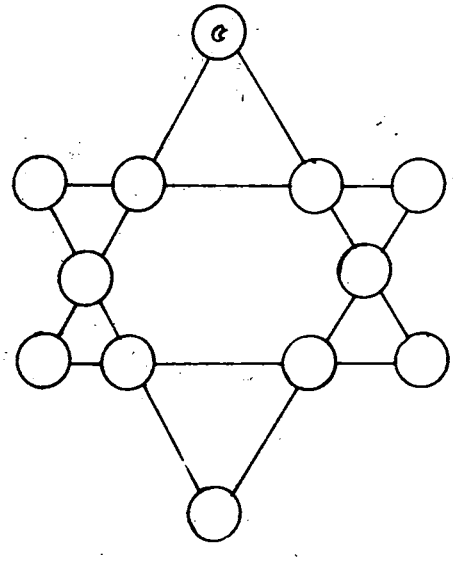

লিখেছ ? বেশ। এবার কোনও বন্ধুকে বলো, সে যেন এই ছবির অন্য গোলগুলোর মধ্যে এবার ৬ থেকে ১৬ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো এমনভাবে বসায় যাতে এক-একটা লাইনের যোগফল সবক্ষেত্রেই হয় ৪২।

হাতে যখন কাজ নেই, তখন কাগজ-পেন্সিল নিয়ে সময় কাটাবার পক্ষে এই ধরনের খেলাগুলো দারুণ মজার। দেখতে-দেখতে সময় কেটে যায়। কেননা, উত্তর করাটা যত সহজ মনে হচ্ছে, আসলে তো তত সহজ নয়। নীচের ছবিতে উত্তর দেওয়া রইল অবশ্য, কিন্তু সেটা দেখবে একান্তই নিজে না পারলে। কেমন ?

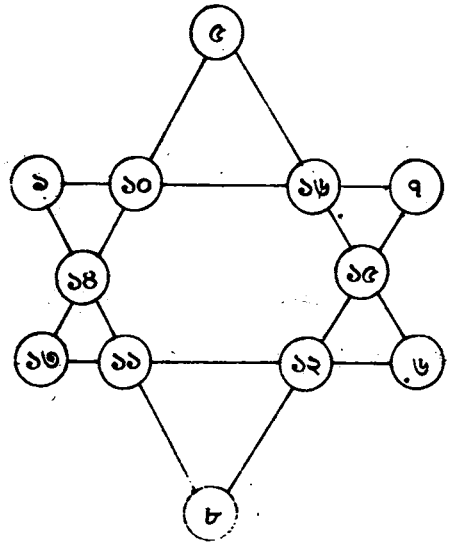

মজারু

হাসিখুশি

"আপনার চোখ ভাল রাখার মলমটা একটু দেবেন ?"

"দ্যাখো ওই তাকের ওপরে বোধহয় আছে। চোখে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, উঠতে পারছি না।"

"শুনলাম তুমি নাকি দেশ ছেড়ে পালাচ্ছ ?"

"সেইজন্যেই তো তোমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা ধার চাইছি।"

"দুঃখিত, কাল তোমাকে একেবারেই চিনতে পারিনি।"

"আজ চিনলে কী করে ?"

"সামনে পড়ে গেছ। না চেনার ভান করি কী করে !"

"মৌর্য যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলতে পারো বাবুয়া ?"

"না, স্যার। তখন আমার জন্ম হয়নি।"

"নীতিমালার সেই বাঘটা যদি পুরস্কার দেবার লোভ দেখিয়ে গলা থেকে হাড় বের করে দিতে বলত, তুমি কী করতে পিকলু ?"

"অত বোকা নাকি আমি ? সাক্ষী রেখে কাগজে সই করিয়ে নিতাম না !"

"ধরো তোমার কোটটা ধার নিয়ে আর ফেরত দিলাম না। তুমি কী করবে ?"

"আগেই কোটের দাম নিয়ে রাখব।"

"বলছেন আপনার বাড়িতে না ঢুকে, রাস্তা থেকে আপনার নাম ধরে ডাকতে। কেন, বাড়িতে গেলে কী হয় ?"

"আমার কুকুরটা যে খারাপ লোকদের একেবারে সহ্য করতে পারে না।"

ছবি : দেবাশিস দেব

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"

-ফেভি ফেয়ারী

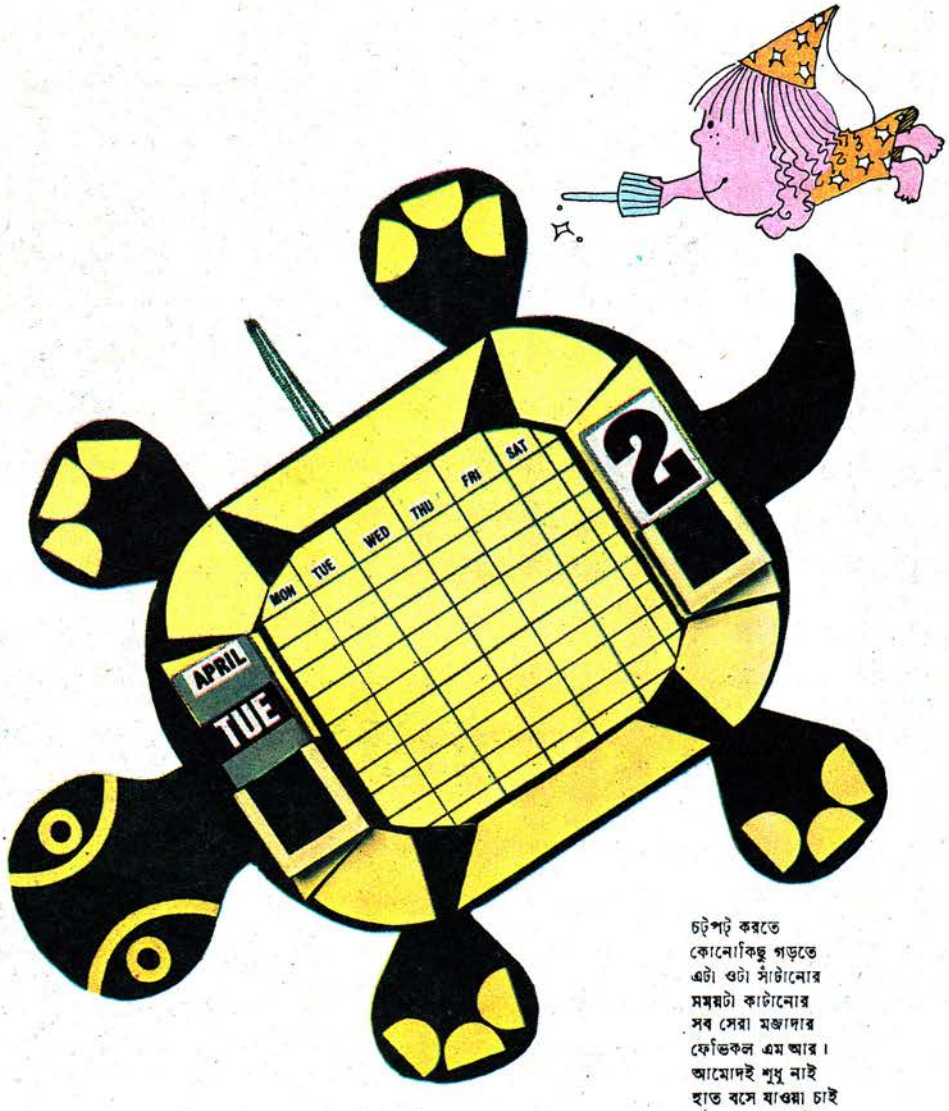

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এটা ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সব সেরা মজাদার
ফেভিকল এম আর।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা-হাতি-বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিঁকে যাবে রবাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল এম-আর।

তোমার দরকার

- কার্ডবোর্ড
- সবুজ ভেলভেট কাগজ
- হলদে চার্ট কাগজ
- বাদামী কাগজ
- পুরানো ক্যালেণ্ডার
- খালি সিগারেট প্যাকেট
- সবুজ সিল্ক সুতো
- ফটো কর্নার (চারটে)
- ফেভিকল এম-আর অ্যাডহীসিভ

১। কার্ডবোর্ড থেকে টাফি-র দেহ আর মাথা কেটে নাও—যে ভাবে দেখানো হয়েছে।

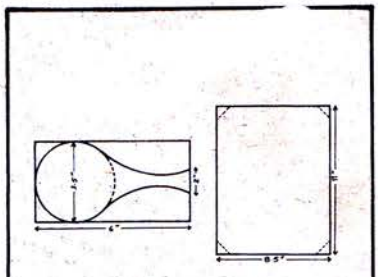

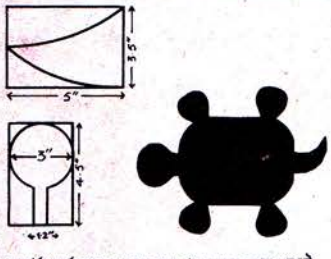

২। কার্ডবোর্ড থেকে তার চার পা আর লেজ কেটে নাও—যে ভাবে দেখানো হয়েছে। সবুজ ভেলভেট কাগজ দিয়ে মুড়ে দাও। মাথা, দেহ, পা আর লেজ একসঙ্গে সেঁটে টাফি বানিয়ে দাও।

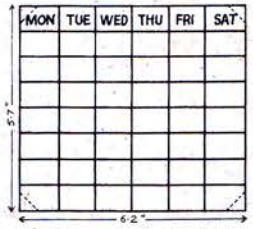

৩। হলদে চার্ট কাগজের ওপর একটা টাইম-টেব্‌ল বানাও—যে ভাবে দেখানো হয়েছে। দিনের সব নামের জন্যে পুরানো ক্যালেণ্ডার কাজে লাগাও। নামগুলো কেটে নিয়ে সেঁটে দাও—যেভাবে দেখানো হয়েছে।

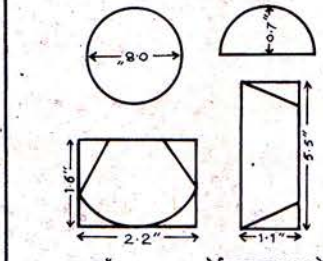

৪। হলদে চার্ট কাগজ থেকে টাফি-র চোখ, ১২টা থাবা আর ৮টা ছাল (প্রতিটি টাইপের জন্যে ৪টে ক'রে)। টাফির মুখ, পা আর দেহকে সাজাও—যে ভাবে দেখানো হয়েছে।

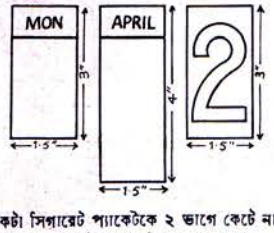

৫। একটা সিগারেট প্যাকেটকে ২ ভাগে কেটে নাও আর সবুজ ভেলভেট কাগজ দিয়ে মুড়ে দাও। ক্যালেণ্ডার থেকে দিন, মাস আর তারিখের নাম কেটে নাও আর চার্ট কাগজের ওপর সেঁটে দাও। কাগজের টুকরোর সাইজ—দিন ও তারিখের জন্যে ৩"×১.৫" আর মাসের জন্যে ৪"×১.৫"।

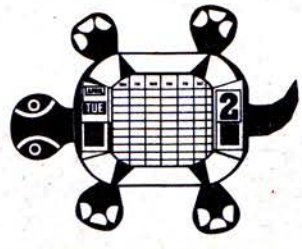

৬। টাফি-র দেহে ৪টি ফটো কর্নার বসাও আর টাইম-টেব্‌ল ঢোকাও। সিগারেট প্যাকের আধ টুকরো গুলো পাশে পাশে সেঁটে দাও আর সেগুলোতে দিন, তারিখ ও মাস লাগানোর ব্যবস্থা কর।

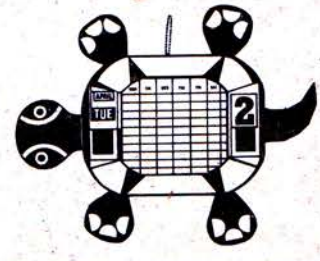

৭। এবার, টাফি-র দেহে সেঁটে দাও সিল্ক দড়ির ফাঁস—যে ভাবে দেখানো হয়েছে। টাফির দেহের উল্টো দিকটা বাদামী কাগজ দিয়ে মুড়ে দাও।

দ্যাখো টাফি কচ্ছপ তৈরী! সে এখন তোমার সারাবছরের প্রতিটি দিন ও তোমার স্কুলের টাইমটেব্‌ল-এর যত্ন নেবে।

ফেভিকল® এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও!

® এইটি [হাতি চিহ্ন] আর **ফেভিকল** ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM/5098 BEN

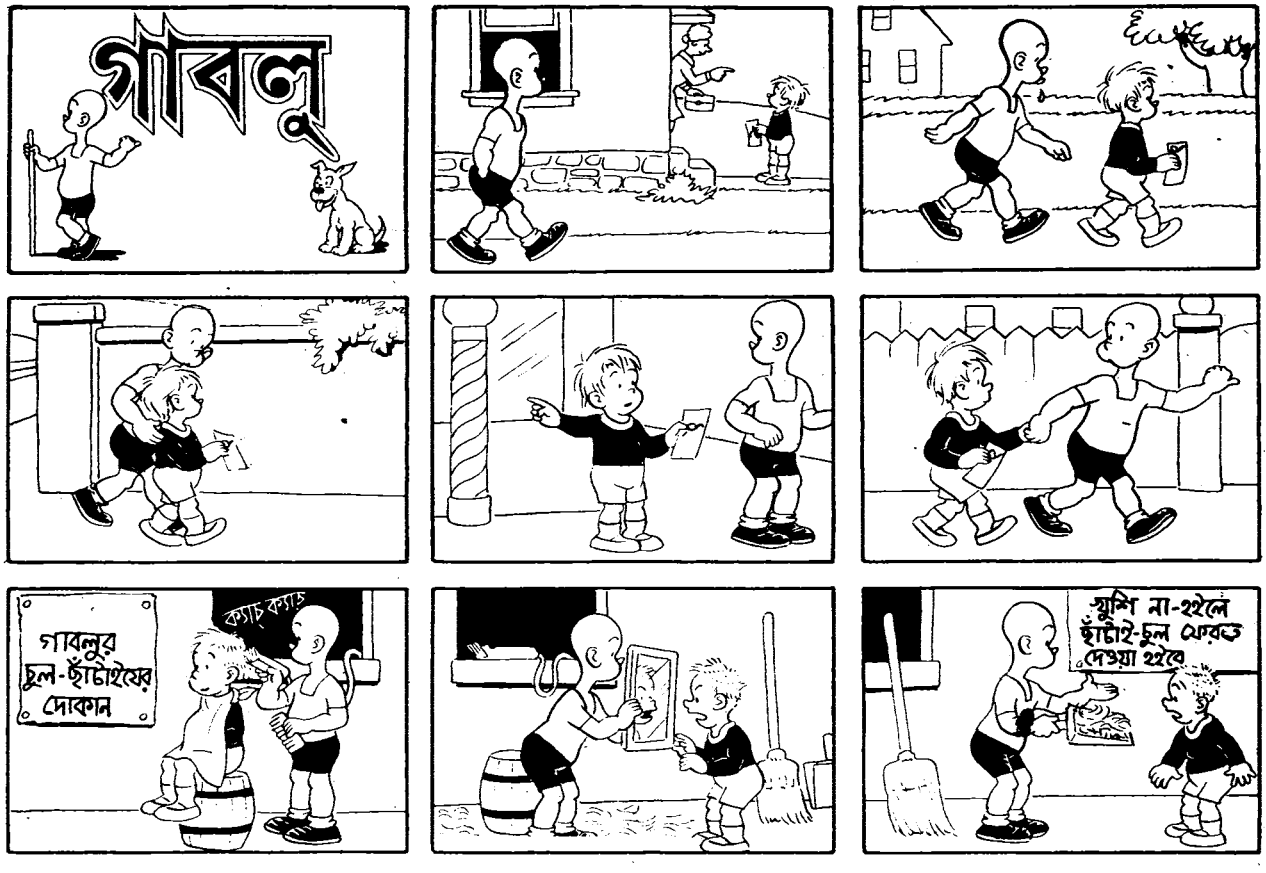
গাবলু
গাবলুর চুল-ছাঁটাইয়ের দোকান
ক্যাচ ক্যাচ
খুশি না-হইলে ছাঁটাই-চুল ফেরত দেওয়া হইবে

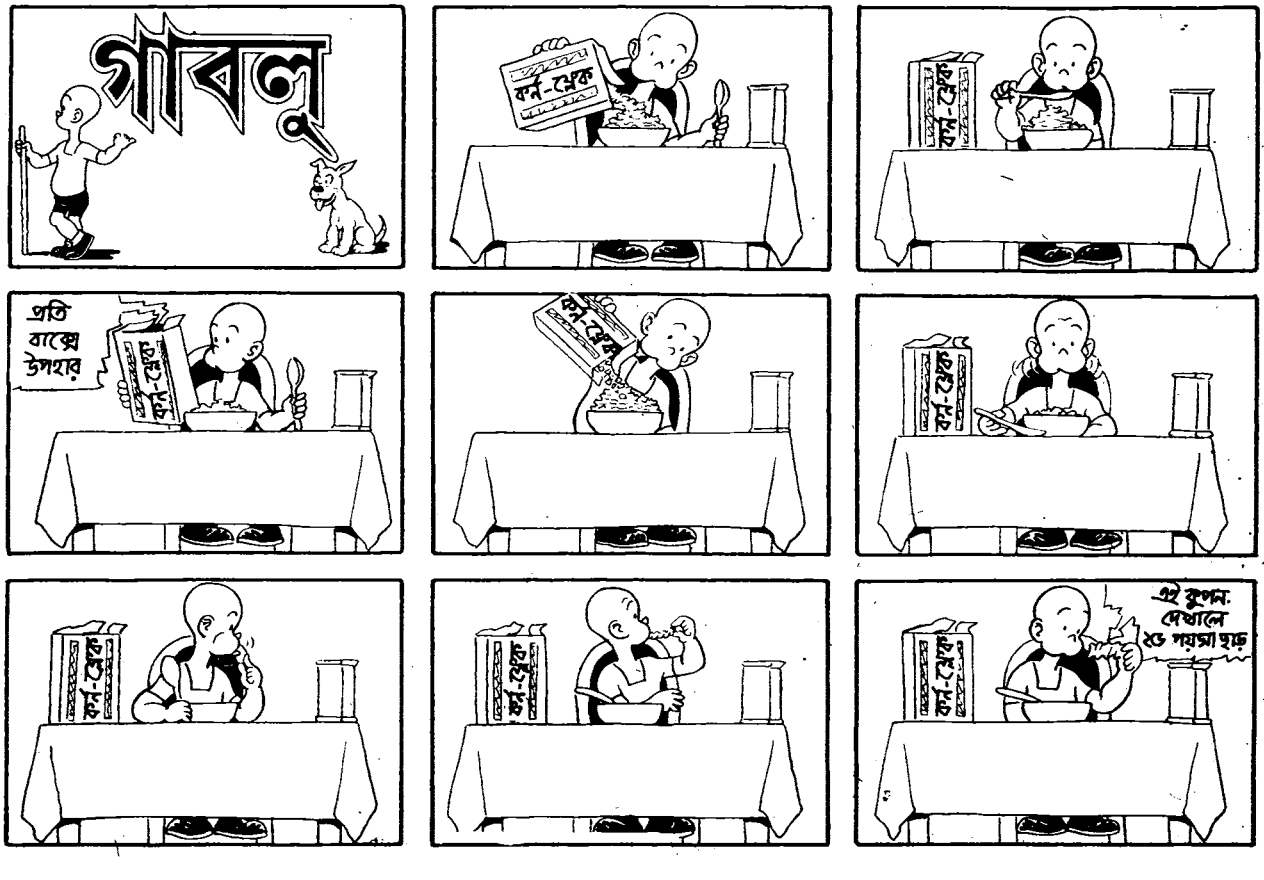
গাবলু
কর্ন-ফ্লেক
প্রতি বাক্সে উপহার
এই কুপন দেখালে ২৫ পয়সা ছাড়

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের জয়ে বিদেশে ভারতীয়দের উল্লাস। এমন দৃশ্য কি ইডেনেও দেখা যাবে না?

সাতাশির স্বপ্ন

অশোক রায়

চোখ একেবারে কপালে তোলার মতোই খবর। ইডেন থেকে সাতাশির বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালের আসর নাকি সরিয়ে নেবার চক্রান্ত চলেছে!

চোখ কচ্‌লে আরেকবার খবরের কাগজের দিকে তাকালাম। না, কোনও ভুল নেই। টেক্‌নিক্যাল কমিটির দুই সদস্য গোলাম আমেদ (চেয়ারম্যান) এবং ফতে সিং রাও গায়কোয়াড় প্রস্তাব দিয়েছেন - উনিশশো সাতাশি সালের ৭ এবং ৮ নভেম্বর কলকাতায় বৃষ্টি হবে। সুতরাং বিশ্বকাপের ফাইনাল কলকাতা থেকে সরানো হোক।

ক্রিকেটার হিসেবে গোলাম আমেদ এবং ফতে সিং রাও গায়কোয়াড়ের বেশ-কিছু পরিচিতি ছিল। কিন্তু ক্রিকেট ছেড়ে দেবার পরে দু'জনেই যে একই সঙ্গে জ্যোতিষ-চর্চায় (নাকি আবহাওয়া-চর্চায়) মনোনিবেশ করেছেন, তা জানা ছিল না। এই উদ্ভট সুপারিশের আসল উদ্দেশ্য যে বিশ্বকাপের ফাইনাল কলকাতা থেকে সরানো, সেটা বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের অন্তত বুঝে নিতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি। সি এ বি-র কর্মকর্তা আলিপুরের আবহাওয়া অফিস থেকে গত দশ বছরের রিপোর্ট সংগ্রহ করে সভায় পেশ করেন। এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দেখান যে, ওই সময়ে কলকাতায় বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং পূর্ব-ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইডেনেই বসবে সাতাশির বিশ্বকাপ ফাইনালের আসর।

উনিশশো তিরাশিতে কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারত গোটা ক্রিকেট-বিশ্বকে চম্‌কে দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো দুর্ধর্ষ দেশের থাবা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল প্রুডেনশিয়াল কাপ। ওঃ, সে এক আনন্দের দিন। মধ্যরাত্রেও ভারতবর্ষ জেগে উঠেছিল এক অবিশ্বাস্য জয়ের আনন্দে। এবং ওইদিনই ভারত এক ঝট্‌কায় উঠে এসেছিল ওয়ান-ডে ম্যাচের সম্রাটের আসনে।

তারপরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অসট্রেলিয়া এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে পরাজিত হলেও ভারত কিন্তু তিন-তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক টুর্নামেণ্টে বিজয়ী হয়। প্রথমে গাওস্করের নেতৃত্বে তিন-দেশের এশিয়া কাপে। সেখানে ভারত ছাড়া হাজির ছিল পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। পরে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপে জয়ী হয় ভারত গাওস্করেরই নেতৃত্বে। অস্ট্রেলিয়া দখলের পরে ভারত যায় শারজায় চারদেশের রথ্‌ম্যানস ট্রফিতে। সেখানে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড ও পাকিস্তান। কপিলের ক্যাপ্টেনশিপে সেখানেও জয়ী হয় ভারত। বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ, বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপ এবং রথম্যান্‌স ট্রফিতে বিজয়ী হবার ফলে এই মুহূর্তে ভারত নিঃসন্দেহে ওয়ান-ডে ম্যাচের হিরো। তাই সাতাশির বিশ্বকাপের দায়িত্ব যৌথভাবে ভারত ও পাকিস্তান পাওয়া মাত্রই আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছি আরেকটি বিশ্বকাপ জয়ের। তোমরাও নিশ্চয়ই চাইছ যে, তিরাশির জয় ধরা থাকুক সাতাশিতেও।

ব্যাট হাতেও মার্শাল মারাত্মক

সম্রাট রায়

সাধারণত, ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট নিয়ে আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। মরশুম শেষে কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হল, শুধু এইটুকু জানতে পারলেই আমাদের যাবতীয় উৎসাহের নিবৃত্তি ঘটে। কিন্তু কাউন্টি ক্রিকেটই হচ্ছে ইংলিশ ক্রিকেটের আসল জিনিস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামী-দামি ক্রিকেটাররা এখানে আসেন ক্রিকেট খেলতে। পেশাদার ক্রিকেটের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই বেড়ে ওঠেন ভবিষ্যতের ইংরেজ ক্রিকেটাররা, প্রতিষ্ঠিতরাও বাড়িয়ে নেন তাঁদের অভিজ্ঞতার পুঁজি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাপারটা এখানে কতখানি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে পারে, চল্‌তি মরসুমের একটা খেলার কথা বললেই তা বুঝতে পারবে।

হ্যাম্পশায়ারের বিরুদ্ধে খেলছিল সমারসেট। তোমাদের মধ্যে ক্রিকেটে যাদের আগ্রহ বেশি, তাদের নিশ্চয় বলে দিতে হবে না সমারসেট কাউন্টির প্রতি আমাদের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। কারণ একদা এই টিমেই খেলেছেন আমাদের প্রিয় ক্রিকেটার সুনীল গাওস্কর।

সেই সমারসেট দল ব্যাট করছিল। হ্যাম্পশায়ারের পক্ষে নতুন বলে আক্রমণ শানাচ্ছিলেন কে জানো ? এই মুহূর্তে পৃথিবীর দ্রুততম ফাস্টবোলার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যালকম মার্শাল। ওদিকে সমারসেটের পক্ষে ব্যাট হাতে ক্রিজে ছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটের সব-সেরা অলরাউণ্ডার ইয়ান বথাম। ইংল্যাণ্ড দল থেকে বথাম কিছুদিন সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন কী, গাওয়ারের ক্যাপ্টেনশিপে ভারত সফরে তিনি আসেননি। অথচ বথামকে বাদ দিয়েই ইংল্যাণ্ড সিরিজ জিতে যায়। অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে বথামকে টিমে ঢুকতে হলে দারুণ কিছু করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে মাঠে নেমেই

ম্যালকম মার্শাল (যখন তিনি ভারত সফরে এসে ব্যাট করছিলেন)

বথাম ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন। মার্শাল সহ হ্যাম্পশায়ার আক্রমণকে তছনছ করে ৭৬ বলে (শেষ পর্যন্ত ১০৬ বলে ১৪৯ রান) সেঞ্চুরি করলেন বথাম। জানা গেল, মরসুমের দ্রুততম সেঞ্চুরি এইটাই। সমারসেটের ২৯৮ রানের জবাবে হ্যাম্পশায়ার ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। গর্ডন গ্রিনিজ সহ সাত উইকেটে পড়ে যায় মাত্র ১০৭ রানে। অষ্টম উইকেটে

ম্যালকম মার্শাল ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

অভাবিতভাবে রুখে দাঁড়ালেন জেমস (১২৪) এবং ট্রেমলেট (১০২ নট আউট) দু'জনেই প্রচণ্ড পিটিয়ে দলকে পৌঁছে দিলেন ৩৩৪ রানে।

৩৬ রানে পিছিয়ে থেকে সমারসেট ঘুরে দাঁড়াল। এবার ব্যাট হাতে বিধ্বংসী মূর্তি ধরলেন ভিভ্ রিচার্ডস। ১৭৬ বলে ১৯টি চার এবং ১০টি ছক্কাসহ করলেন ১৮৬ রান। সমারসেট ৩৫৮ রান করে আবার পৌঁছে গেল ম্যাচ জেতার জায়গায়।

৬৬ ওভারে ৩২৩ রানের প্রয়োজন সামনে রেখে হ্যাম্পশায়ার ৬৫ ওভারে পাঁচ উইকেটে পৌঁছল ৩১৩ রানে, প্রধানত ক্রিস স্মিথ (১২১) এবং পল টেরির (৮৩) সহায়তায়। শেষ ওভারে তখনও দরকার দশ রান। বল করবেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দীর্ঘদেহী ফাস্টবোলার জোয়েল গার্নার। ব্যাট করবেন মার্শাল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে নতুন বলে এঁরা দুজনেই আক্রমণ শুরু করেন। এখানে তাঁরা কিন্তু পরস্পরের শত্রু।

প্রথম বলেই দু' রান নিলেন মার্শাল। পরের বল কাট করে বাউণ্ডারি। রুদ্ধশ্বাস সেই ওভারের আরও একটি বলকে লং-অনের ওপর দিয়ে তুলে দিলেন মার্শাল। হ্যাম্পশায়ার জিতে গেল পাঁচ উইকেটে। বোলার মার্শাল নয়, ব্যাটসম্যান মার্শালকে কাঁধে নিয়ে ফিরলেন সমর্থকরা।

ব্যাট দিয়ে যায় চেনা

রাজা গুপ্ত

পৃথিবীর সব দেশের বোলাররাই বুঝে নিয়েছিলেন ১৯৮৪র ১ জানুয়ারি থেকে তাঁদের সাবধান হতে হবে। কারণ বেশ কয়েকটি ম্যাচে রান না পেয়ে দুনিয়ার সেরা ব্যাটসম্যান ভিভ রিচার্ডস রীতিমত খাপ্পা হয়েই 'হাতিয়ার' বদলেছেন। অর্থাৎ ব্যাট পালটেছেন। ডাক্তারি-শাস্ত্রে রক্তাল্পতার ওষুধ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্যাটিং-শাস্ত্রে রান-স্বল্পতার ওষুধ ঠিক জানা নেই। কিছুদিন রান না পেয়ে ভিভ তাঁর প্রিয় 'ডবল-এস' ছাপ দেওয়া স্টুয়ার্ট সারিজ কোম্পানির ব্যাটের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ছেদ করে ফেললেন। চুরাশির শুরু থেকেই বোলারদের ওপর প্রভুত্ব করার জন্যে ভিভের হাতে 'রাজদণ্ড' হিসেবে থাকছে ডানকান ফিয়ার্নলের 'ম্যাগ্‌নাম' ব্যাট। নতুন করে ভিভের রান-যাত্রা শুরু এই ব্যাট দিয়েই।

ব্যাটের গ্রিপ, ব্যালান্স, ওজন, উইলোর গ্রেন, ব্লেডের থিক্‌নেস ইত্যাদি সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো নিয়ে ক্রিকেটারদের অনেক রকম বায়না, খুঁতখুঁতুনি থাকে। যেমন ক্লাইভ লয়েডের ব্যাটের ওজন তিন পাউণ্ড না হলে মনই উঠত না (এত ভারী ব্যাটে আর কেউ খেলেন না)। অথচ একটা সাধারণ ব্যাটের ওজন মাত্র ২ পাউণ্ড ৪ আউন্স। অতীতের বিখ্যাত ব্যাটসম্যান ওয়ালটার হ্যামণ্ড আবার ভালবাসতেন ২ পাউণ্ড ২ আউন্সের হালকা ব্যাট। ভিভ্ রিচার্ডসের ব্যাটের হ্যাণ্ডেলে পরানো থাকে দু-দুটি রবারের 'গ্রিপ'। আমাদের সানি গাওস্করের ব্যাটের পেছন দিকে একদা খান-দশেক ফুটো রাখা হত. সানিরই বিশেষ নির্দেশে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার জন ইন্‌ভেরারিটি ব্যাট কেনার সময় দোকানে গিয়ে গোড়াতেই মেলে ধরতেন একখানা ড্রইং-করা কাগজ। ব্যাটের কোন্-কোন্ অংশের মাপ কেমন হবে ড্রইংয়ে থাকত তারই নির্দেশ।

ব্যাট পছন্দের ব্যাপারে ক্রিকেটাররা কতখানি খুঁতখুঁতে সেটা ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেটার কেন ব্যারিংটনের ব্যাট বাছাইয়ের গল্প শুনলে বুঝতে পারবে। একবার স্টুয়ার্ট সারিজ কোম্পানির শো-রুমে প্রায় শ' পাঁচেক ব্যাট খুঁটিয়ে দেখার পরে মাত্র দুটো ব্যাট পছন্দ করেন ব্যারিংটন। কোম্পানির সুনাম রাখতে পেরে সেলস্‌ম্যানরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু ব্যাট নিয়ে চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন ব্যারিংটন।

"কী ব্যাপার?" সেলস্‌ম্যানদের বিস্মিত প্রশ্ন।

ব্যারিংটন জবাব দিলেন, "ওই ব্যাটগুলো আর একবার দেখে যাই, যদি ভাল ব্যাটটা চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকে।"

আসলে ব্যাটসম্যানদের কাছে ব্যাটই আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার। তাই সকলেই চান সেটি যেন মাঠে বিশ্বাসভঙ্গের কারণ না ঘটায়। ইণ্ডিয়ান টিমে গাওস্কর যখন 'গ্রে-নিকলস্' ব্যাটে খেলেন (আগে খেলতেন ডানকান ফিয়ার্নলে ব্যাটে)

গাওস্কর খেলেন 'গ্রে-নিকলস্' ব্যাটে

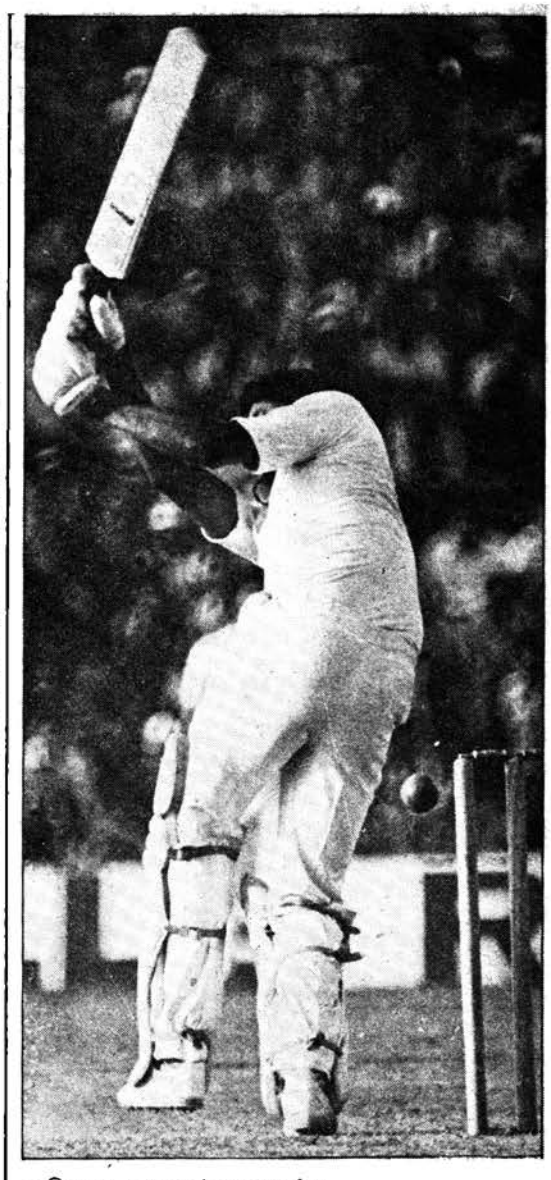

কপিলদেব খেলেন 'ভ্যাম্‌পায়ার'-এ

তখন দিলীপ বেংসরকর নামেন 'গান অ্যাণ্ড মুর' নিয়ে। সন্দীপ পাতিল, রবি শাস্ত্রী কিংবা মহিন্দর অমরনাথের যখন 'সাইমণ্ডস্' ছাড়া চলে না, তখন কপিলদেব তুষ্ট 'ভ্যান্‌পায়ার'-এ। গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের পছন্দ ছিল 'সেণ্ট পিটার্স' (পরে 'কাউন্টি' ব্যাটেও খেলেছেন) ব্যাট। পছন্দের শেষ নেই। আর শেষ নেই বলেই 'স্ল্যাজেঞ্জার', 'ক্রাউন', 'কোকাবুরা', 'কাউন্টি'র পেছনে আরও বহু নামের ভিড়।

এটা ঠিক যে, ব্যাট পালটালেই রান-স্বল্পতার অসুখ ভাল হয়ে যায় না। তবে ব্যাট পালটেই ভিভ রিচার্ডস রান পেতে শুরু করায় পৃথিবীর সব বোলারদের দুশ্চিন্তা কিন্তু বাড়ল।

অতীতের দুই দিকপাল খেলোয়াড়, আমেদ খান ও শৈলেন মান্না ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

সোনালি বিকেল, হারানো অতীত

নৃপতি চৌধুরী

মোহনবাগান মাঠে এক মনোরম বিকেলে অতীত এবং বর্তমান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। অতীত দিনের কীর্তিমান ফুটবলারদের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচে মুখোমুখি হলেন একালের নামী ফুটবলাররা। যেহেতু প্রদর্শনী ম্যাচ, তাই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারটা ছিল না। কিন্তু উপস্থিত ফুটবলপ্রেমী দর্শকরা দু' চোখ ভরে দেখলেন আমেদ খান এবং শৈলেন মান্নার মতো ফুটবলের প্রবাদ-পুরুষদের।

আমেদ খান, ভারতবর্ষের সব-সেরা লেফ্‌ট-ইন্‌, খেলতেন লাল-হলুদ জার্সি পরে ইস্টবেঙ্গলে। শৈলেন মান্না, ভারতের সর্বোত্তম লেফ্‌ট-ব্যাক, খেলতেন সবুজ-মেরুন জার্সি পরে মোহনবাগানে। যৌবনে দু'জনেই ছিলেন দু'জনের ঘোর শত্রু। উনিশশো পঁচাশির সোনালি বিকেলে আমেদ এবং মান্না মাঠে নামলেন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। ওঁদের পাশে-পাশে এগিয়ে গেলেন পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করে রেখেছিলেন যাঁরা, সেই চুনি, পি· কে·, বলরাম। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের রেষারেষি নয়, ওঁদের উদ্দেশে দর্শকদের বিনম্র হর্ষধ্বনি যেন পুষ্পার্ঘ্যের মতোই ঝরে পড়ল গ্যালারি থেকে। মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অমর মুহূর্তটি প্রত্যক্ষ করলেন একালের ফুটবলাররা।

শৈলেন মান্নার অধিনায়কত্বে একদিকে খেলছিলেন অতীতের খেলোয়াড়েরা। ফেডারেশন কাপজয়ী ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা ছিলেন আমেদ খানের নেতৃত্বে অন্যপক্ষে। গোলে মিনিট দশেক ছিলেন তরুণ বসু। ওরই মধ্যে শূন্যে পাখির মতো উড়ে ফরোয়ার্ডের মাথা থেকে ছোঁ মেরে দু' হাতে বল ধরে বুঝিয়ে দিলেন জীবন থেকে কিছুই হারিয়ে যায়নি তাঁর। সুরজিতের পায়ের কিছু-কিছু ধারালো কাজ, গৌতম সরকারের জেদ, সুভাষ ভৌমিকের হুড়মুড়িয়ে ছোটা, শ্যাম থাপার বডি ফেন্ট ফেলে-আসা এক-একটা বিকেলকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

এই ম্যাচে গোল বড় ব্যাপার ছিল না। তবু গোল একটা হয়েছে। ফেডারেশন কাপজয়ী ইস্টবেঙ্গলের তরুণ ব্যাক কবীর বসু কর্নার-কিক থেকে চমৎকার ইনসুইংয়ে বল রেখেছিলেন সেকেণ্ড বারে। অনেক দেরিতে দিক পাল্টে বল শিবাজি ব্যানার্জির নাগাল এড়িয়ে ঢুকে যায় গোলে। ওই এক গোলেই হয়ে যায় মীমাংসা। খেলা-শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ওলিম্পিয়ান রামচন্দ্র পরব এবং ফুটবলার-কোচ ল্যাংচা মিত্রকে অর্থসাহায্য করা হয়।

ওর দাঁতকে এখন থেকেই সুরক্ষিত করে নিন

এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ একে বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে করুন

দাঁতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে নিতে হ'লে, দন্তছিদ্রের সংরক্ষণ করুন আর, বিনাকা ফ্লোরাইড-এর ফ্লোরাইডই দেয় ঐ অপরিহার্য সংরক্ষণ। কারণ, মুখের ভেতরের ক্ষতিকর অ্যাসিড যখন দাঁতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন এই ফ্লোরাইড, দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে দন্তছিদ্র হওয়া রোধ করে—আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দন্তক্ষয় হওয়াও রোধ হয়।

তাই বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে, দন্তছিদ্র হওয়া বন্ধ করুন, দন্তক্ষয় রোধ করুন।

দাঁতে নব জীবনের সাড়া

বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ULKA-HCG-BF-10-85-BENG

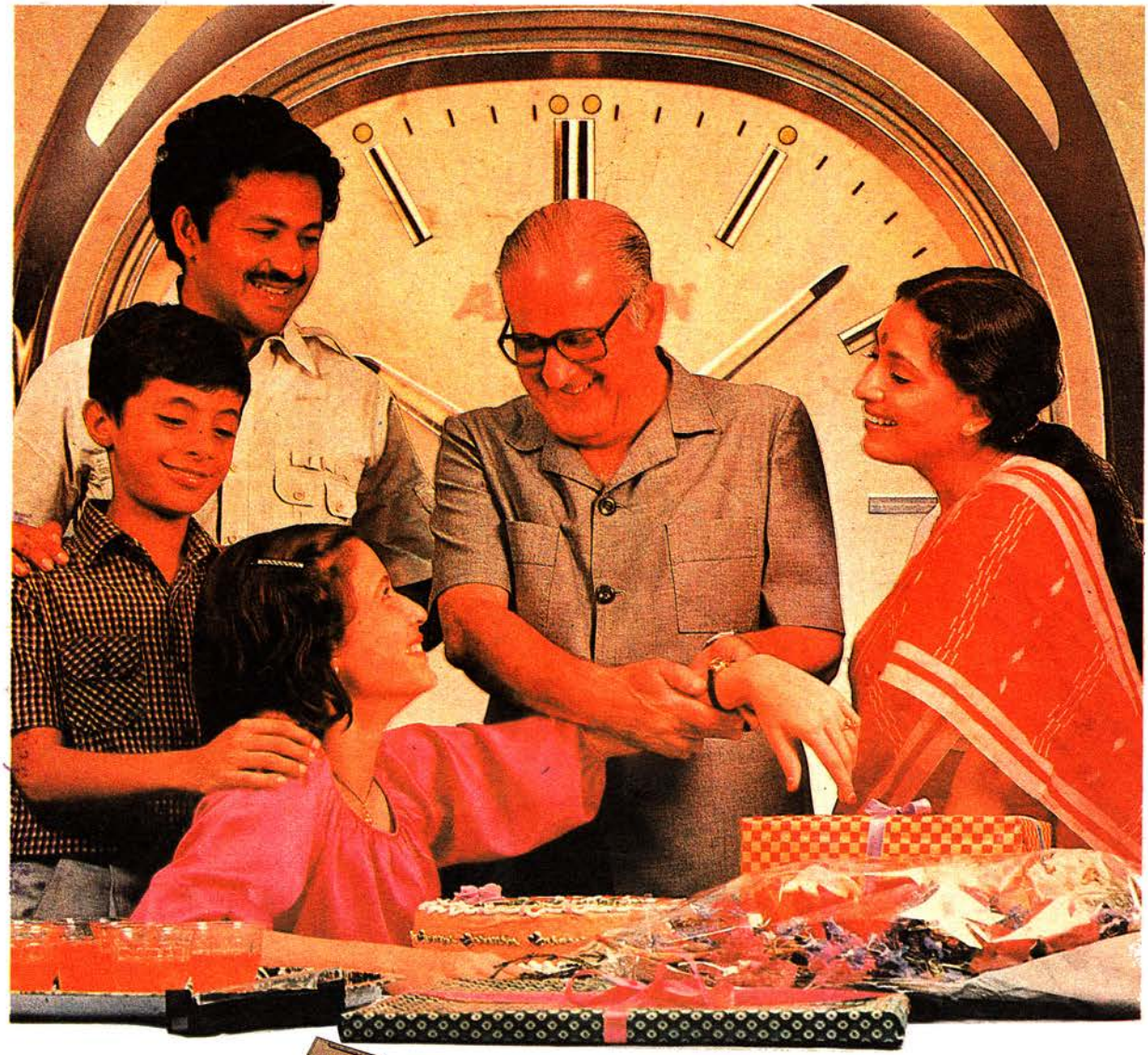

চিরকাল উপভোগের সম্পদ। অতুলনীয় জাপানি কারিগরীর অনন্য উৎপাদন। যেমন সুন্দর তেমনই সঠিক। আপনার পছন্দের জন্যে মনমাতানো ঘড়ির সুবিশাল শ্রেণী... অলউইন।

অলউইন। এমন এক জিনিষ যা নিজে ভোগ ক'রে বা উপহার দিয়ে গৌরব বোধ করবেন!

অলউইন
ঘড়ি

Manufactured under licence from
SEIKO
চাবি দেওয়া • অটোমেটিক • কোয়ার্টজ

ALLWYN

SAA/HAL/2326/BEN